এই বৎসরটি শ্রীঅরবিন্দের সার্ধ-শতবর্ষের জন্য উৎসর্গীকৃত

(১৫ অগাস্ট ১৮৭২—১৫ অগাস্ট ২০২২)

১৫.৮.১৮৭২ ১৫.৮.১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দের শতবর্ষে যে শ্রেষ্ঠতম সম্মান আমরা তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে পারি তা হ'ল প্রগতির জন্য এক তৃষ্ণাকে অর্জন করা এবং ভগবৎ প্রভাবের অভিমুখে আমাদের সকল সত্তাকে উন্মুক্ত করে তোলা, পৃথিবীর বুকে তিনি ছিলেন যার অগ্রদূত।

শ্রীমা

জননী, মা জননী! তোমার সকল সন্তানকে তুমি তোমার বিশাল বুকের মধ্যে তুলে ধরেছ গাঢ় আলিঙ্গনে, সকলকে সমানভাবে তোমার ভালবাসায় ঘিরে রেখেছ।

শ্রীমা

'রূপান্তর' প্রকাশে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সহ যে সমস্ত বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, গ্রাহক, পাঠক ও গ্রন্থ পরিবেশক যে সহযোগিতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করছেন — তাদের প্রতি রইল আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

❑ গ্রাহক মূল্য ❑❑ ১৫০ টাকা (এক বছরের জন্য)

❑ পত্রিকা প্রকাশের দিন ❑❑ ২১ ফেব্রুয়ারী, ২৪ এপ্রিল, ১৫ অগাস্ট ও ২৪ নভেম্বর

❑ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়

❑ যোগাযোগ ❑ মোবাইল ❑❑ ৯৪৩২৫২৫৭৯২ ❑❑ ৯৮৩১৩২২৪৩০

❑ ই-মেল ❑❑ roopantar@hotmail.com

❑ © শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট,
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

❑ সম্পাদনা ও প্রকাশনা ❑❑ রত্নাকর সেনগুপ্ত

❑ কো-অর্ডিনেটর ❑❑ জয়দীপ চক্রবর্তী

❑ অক্ষর বিন্যাস ❑❑ শিলালিপি,
বাসব চট্টোপাধ্যায়, ২০এ, বলাই সিংহ লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

❑ মুদ্রণ ❑❑ প্রিন্ট ও প্রসেস,১৫/৫/১, কে. বি. সরণী,
কলকাতা - ৭০০ ০৮০

❑ ৫০ টাকা

রূপান্তর : প্রযত্নে, সত্যপ্রিয়া গণেশ, ১/১এ, বেদিয়াডাঙ্গা সেকেণ্ড লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০৩৯

মায়ের প্রার্থনা

আগস্ট ২৫, ১৯১৪

ভগবান! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার কর্ম সংসিদ্ধ হোক। আমাদের ভক্তিকে দৃঢ় কর, সমর্পণকে বাড়িয়ে তোল, পথ আলোকিত কর। অন্তরে তোমাকে আমরা গড়ে তুলি আমাদের পরম অধীশরূপে, যাতে সমস্ত পৃথিবীরও তুমি পরম অধীশ হয়ে উঠতে পার।

বাক্য সব আমাদের এখনো অজ্ঞানাচ্ছন্ন, উজ্জ্বল কর তাদের।

আস্পৃহা আমাদের এখনো মলিন, শুদ্ধ কর তাকে।

কর্ম আমাদের এখনো অসমর্থ, সক্ষম করে তোলো তাকে।

ভগবান! পৃথিবী আর্ত, শোকগ্রস্ত; এ জগৎ বিশৃঙ্খলার বাসগৃহ হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার এত গাঢ় যে এক তুমি তাকে অপসারিত করতে পার। এস, প্রকাশ কর নিজেকে, তোমার কর্ম সংসিদ্ধ হোক।

উৎস :*Prières et Méditations*

গ্রন্থের অনুবাদ : *ধ্যান ও প্রার্থনা*, পৃ : ১৩০,

অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

❑ সূচী ❑

			পৃষ্ঠা
❑ সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে: ...''তুমি অনুভব করবে সত্যসত্যই মায়ের সন্তান তুমি,''...	❑❑	শ্রীঅরবিন্দ	১
❑ ভগবান-জননী	❑❑	শ্রীঅরবিন্দ	৩
❑ ...''ভগবান ব্যতীত তোমার অস্তিত্ব থাকত না''...	❑❑	শ্রীমা	৪
❑ তিনি আছেন	❑❑	শ্রীমা	৫
❑ বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা	❑❑	শ্রীঅরবিন্দ	৭
❑ ...''আমার কোন সন্তান ভয় পেতে পারে না।''...	❑❑	শ্রীমা	৯
❑ প্রার্থনা ও আস্পৃহা	❑❑	শ্রীমা	১২
❑ শান্তি ও স্থিরতা	❑❑	শ্রীমা	১৭
❑ ...'' চিন্তা মানুষকে শাসন করছে, মানুষ চিন্তাকে নয়।'' ...	❑❑	শ্রীমা	১৯
❑ ...''এই চেতনা শুধু মানুষেই নেই; আছে বিশ্বের সবকিছুর মাঝে''...	❑❑	শ্রীমা	২৩
❑ শিক্ষা	❑❑	শ্রীমা	২৫
❑ যোগপথের বাধাবিঘ্ন	❑❑	শ্রীঅরবিন্দ	২৮
❑ প্রাণের রূপান্তর	❑❑	শ্রীঅরবিন্দ	৩০
❑ আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর	❑❑	শ্রীঅরবিন্দ	৩৩
❑ পরম সত্য মনের ঊর্ধ্বে	❑❑	শ্রীমা	৩৫

নদী চলে যেমন সাগরের দিকে, আমাদের সকল চিন্তা সকল অনুভব তেমনি চলবে ভগবানের দিকে।

শ্রীমা

উৎস: *মাতৃবাণী*, পৃ:৭, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

সম্পাদকীয়-এর পরিবর্তে:

...“তুমি অনুভব করবে সত্যসত্যই মায়ের সন্তান তুমি,”...

— শ্রীঅরবিন্দ

যদি তুমি দিব্যকর্ম্মের সত্য কর্ম্মী হতে চাও, তবে তোমার লক্ষ্য প্রথমেই হবে সকল বাসনা থেকে, আত্মসর্ব্বস্ব অহঙ্কার থেকে, নিজেকে নিঃশেষে মুক্ত করা। তোমার সমস্ত জীবন হবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি ও বলি। কর্ম্মে তোমার একমাত্র লক্ষ্য হবে ভাগবতী শক্তির লীলায় সেবা করা, তাঁকে ধারণ করা, সার্থক করা, তাঁর প্রকাশের যন্ত্র হয়ে ওঠা। ভাগবত চেতনায় তোমাকে পূর্ণতর হয়ে উঠতে হবে যেন শেষে তোমার ইচ্ছায় ও তাঁর ইচ্ছায় কোনো পার্থক্য আর না থাকে, তাঁর প্রেরণা ব্যতীত আর কোনো সঙ্কল্পই তোমার মধ্যে স্থান না পায়, তাঁরই সজ্ঞান কর্ম্ম ছাড়া তোমার মধ্যে এবং তোমাকে আশ্রয় ক'রে আর কোন কর্ম্মই যেন না হয়।

যে পর্য্যন্ত তুমি এই সম্পূর্ণ সক্রিয় একত্ব স্থাপন করতে না পেরেছ ততদিন মনে করবে তোমার দেহ ও আত্মা নিয়ে তুমি সৃষ্ট মায়েরই সেবার জন্য, তোমার সব কর্ম্ম তাঁরই প্রীত্যর্থে। পৃথক কর্ত্তৃত্ববোধ যদি তোমার মধ্যে প্রবল থাকে, যদি তোমার অনুভব হয় তুমিই কর্ম্ম করে চলেছ, তবুও সে কর্ম্ম করবে তাঁরই উদ্দেশ্যে। অহঙ্কারের আপন অভিরুচির উপর সকল ঝোঁক, ব্যক্তিগত যাবতীয় লাভের লালসা, আত্মসার বাসনার সকল প্রত্যাশা স্বভাব থেকে উন্মূলিত করতে হবে। ফলের জন্য কোন দাবি থাকবে না, পুরস্কারের জন্য কোন স্পৃহা থাকবে না। একমাত্র যে ফল তুমি পাবে তা হল মা ভগবতীর তৃপ্তি, তাঁর কর্ম্মের সিদ্ধি; তোমার একমাত্র পুরস্কার ভাগবত চেতনার প্রশান্তির শক্তির আনন্দের মধ্যে তোমার অবিচ্ছিন্ন প্রগতি। সেবার আনন্দ, কর্ম্মের সহায়ে অন্তরের পুষ্টির আনন্দ— নিরহঙ্কার কর্ম্মীর পক্ষে এই যথেষ্ট প্রতিদান।

কিন্তু একদিন আসবে যখন ক্রমেই তোমার এ অনুভব বৃদ্ধি পাবে যে তুমি যন্ত্র, কর্ম্মী নও। কারণ প্রথমত ঐকান্তিক নিষ্ঠার বলে মায়ের সাথে তোমার মিলন এমন নিবিড় হয়ে উঠবে যে কেবল তদগত হয়ে তাঁর হাতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করলেই তাঁর আশু নির্দ্দেশ, তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশ ও প্রেরণা পাবে— কি করতে হবে, কি উপায়ে করতে হবে, ফলই-বা কি, এ সকলের অভ্রান্ত সন্ধান মিলবে। এর পরে তোমার উপলব্ধি হবে ভাগবতী শক্তি কেবল প্রেরণা দেন না, পথ দেখিয়ে চলেন না, পরন্তু তোমার কর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও উদ্‌যাপন তিনিই করেন। তোমার সকল গতিবিধির উৎস তিনি, তোমার সকল শক্তি তাঁরই, তোমার মন প্রাণ দেহ তাঁর ক্রিয়ার চৈতন্যময় আনন্দময় যন্ত্র, তাঁর লীলার উপকরণ, স্থূল জগতে তাঁর প্রকাশের আধার। এই ঐক্য ও নির্ভর অপেক্ষা সুখের অবস্থা আর কিছু হতে পারে না, এই পদে উঠে দাঁড়ালে অজ্ঞানের যে

সংঘর্ষময় বেদনাময় জীবন তার সীমানা পার হয়ে তুমি প্রবেশ করবে এসে তোমার অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের মধ্যে, তথাকার গভীর শান্তির, তীব্র আনন্দের মধ্যে।

এই রূপান্তর যখন চলছে ঠিক তখনই বিশেষ ক'রে তোমার প্রয়োজন হবে অহঙ্কারের সকল বিকৃতি-দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। তোমার আত্মদানের, উৎসর্গের নির্ম্মলতাকে কোন দাবি কোন জেদ অতর্কিতে এসে যেন কলঙ্কিত না করে। কর্ম্ম বা কর্ম্মফলে কোন আসক্তি রাখবে না, কোন রকম সর্ত্ত উপস্থিত করবে না, যে শক্তির কাজ তোমাকে অধিকার করা, ফিরে তাকেই তুমি অধিকার করবে— এ রকম কোন দাবি করে বসবে না; যন্ত্র ব'লে কোন গর্ব্ব রাখবে না, কোন আত্মম্ভরিতা বা ঔদ্ধত্য রাখবে না। তোমার মনের প্রাণের দেহের মধ্যে কোথাও এমন কিছু থাকতে দেবে না যা তোমার ভিতর দিয়ে যে মহতী শক্তিরাজি কাজ করে চলেছে তাদের কোনক্রমে নিজের ব্যবহারের জন্য বিকৃত করে ফেলতে পারে বা আপন ব্যষ্টিগত স্বতন্ত্র তৃপ্তির জন্য অধিগত করতে পারে। তোমার শ্রদ্ধা, তোমার ঐকান্তিকতা, তোমার আস্পৃহার অমলতা পায় যেন পরম পরাকাষ্ঠা, তাতে তোমার সত্তার সকল ক্ষেত্র সকল স্তরকে যেন রাখে পরিপূর্ণ ক'রে। তা হলে যে সব উপকরণে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, যত সব প্রভাবে বিকৃতির জন্ম দেয়, একে একে তারা তোমার প্রকৃতি থেকে স্খলিত হতে থাকবে।

এই সিদ্ধির শেষ অবস্থা আসবে তখন যখন তুমি মা ভগবতীর সাথে সম্পূর্ণ একীভূত, যখন এ বোধ আর তোমার থাকবে না যে তুমি ভিন্ন, পৃথক এক সত্তা, যন্ত্র, সেবক বা কর্ম্মী। তুমি অনুভব করবে সত্যসত্যই মায়ের সন্তান তুমি, তাঁর চেতনা ও শক্তির সনাতন অংশ, সতত তিনি তোমার মধ্যে, তুমিও সতত তাঁরই মধ্যে। তোমার সকল চিন্তা সকল দৃষ্টি সকল কর্ম্ম তোমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গ নিঃসৃত তাঁর হতে— তাঁরই— এই হবে তোমার সহজ স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধি। তুমি জানবে দেখবে বোধ করবে যে মা তোমাকে এক বিশেষ ব্যক্তি ও শক্তিরূপে তাঁর আপন সত্তা থেকে নিজেই গড়ে তুলেছেন, লীলার জন্য অন্তর থেকে বাহিরে প্রকট করে ধরেছেন, তবুও সর্ব্বদা তাঁরই মধ্যে নিরাপদে তুমি রয়েছ, তাঁর সত্তায় তোমার সত্তা, তাঁর চেতনায় তোমার চেতনা, তাঁর শক্তির শক্তি, তাঁর আনন্দের আনন্দ তুমি। এই অবস্থা যখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে আর তাঁর অতিমানস তেজোরাজি তোমাকে অবাধে পরিচালিত করতে পারবে, তখনই দিব্যকর্ম্মে হবে তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সিদ্ধি। জ্ঞান, সঙ্কল্প, কর্ম্ম হবে অভ্রান্ত সরল জ্যোতির্ম্ময় স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্দ্দোষ— পরমেশ্বর হতে উৎসারিত এক প্রবাহ, শাশ্বতের এক দিব্য অয়ন।

উৎস : *The Mother*, অনুবাদ : নলিনীকান্ত গুপ্ত,
মূল বানান অপরিবর্তিত।

ভগবান-জননী

শ্রীঅরবিন্দ

সচেতন সনাতন শক্তি এক রয়েছে এখানে,
দুঃখের আর মর্ত্যজন্মের পশ্চাতে,
ভ্রান্ত-বুদ্ধির আর কালের বিভ্রান্ত মন্থরতার পশ্চাতে—
বিধাতার জননী সে, ভগ্নী সে, পত্নী সে,
তাঁর জ্ঞানের তনয়া, তাঁর শক্তির সঙ্গিনী,
বিশ্বাতীতের প্রচ্ছন্ন বুকের ভিতর থেকে উৎক্রান্ত হয়েছে,
মনের প্রাণের রামধনু জগৎ সব নির্মাণের জন্য।
একদিকে পরাচেতনার অনুত্তর জ্যোতি,
অন্যদিকে অচেতনার বিপুল চিন্তাহারা প্রয়াস—
জড়ের সুপ্তির এলায়িত নৈমিত্তিক ধারায়,
আর নক্ষত্ররাজির নিদ্রামগ্ন গতিভঙ্গে—
মাঝখানে শূন্যের মধ্যে সবলে এনে ধরে সে
তার জীবনের অভিযান, তার লালসার স্বপ্ন।
তামসী শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে সে রয়েছে এখানে,
ব্যোম-প্রসারে যত প্রমাদ যত পাপ তা নিরাময় করতে,
অজ্ঞানময় জগতের করুণ বিচ্ছেদ-গাথা
আনন্দের দিব্য মহামিলনে আর
ভাগবত রভসের হাসি ও উল্লাসে পরিণত করতে।
ভাগবতী জননী হলেন আমাদের অন্তরাত্মার প্রভু,
কালের ধারায় ভগবানের যে জন্ম তার লীলাসঙ্গী আমরা,
তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর আনন্ত্যের অংশীদার।।

উৎস: ***The Mother of God*****, অনুবাদ : নলিনীকান্ত গুপ্ত**

...''ভগবান ব্যতীত তোমার অস্তিত্ব থাকত না''... —শ্রীমা

জড়জগৎ[১]

সৃষ্টির মধ্যে লোকসমূহের যে ক্রমবিন্যাস, তাতে আমাদের এই জড়জগৎটার স্থান কি খুব নিচে নয়?

আমাদের জগৎটা হচ্ছে জড়তম, আর সেই কারণে সেটা 'নিচে' হবে তার কোন মানে নেই, অন্ততপক্ষে তার জড়গুণের জন্য নয়; যদি এই জগতের স্থান নিচে হয়ে থাকে, তার কারণ এই জগৎ অন্ধকার ও অজ্ঞানতায় ভরা, তার কারণ এই নয় যে তা জড়ময়। 'জড়'-এর সঙ্গে অন্ধকার ও অজ্ঞানতার সমার্থ করা ভুল। আর জড় জগৎটাই একমাত্র জগৎ নয় যেখানে আমরা বাস করি: বরঞ্চ অনেক ভিন্ন ভিন্ন জগৎ যাদের মধ্যে আমরা একই সময়ে বাস করে থাকি তাদের মধ্যে এটি একটি, বলতে পারা যায়, সবজগতের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা জড়ময় এই জগৎ অন্যসব জগতের ঘনীভূত বিন্দু; অন্যসব জগতের নিবিড় রূপ পাওয়ার ক্ষেত্র এইটি; এই সেই স্থান যেখানে অন্যসব জগৎকে অভিব্যক্ত হতে হবে। বর্তমানে এ জগৎ অসঙ্গতি এবং অন্ধকারে পূর্ণ; কিন্তু সেটা একটা অঘটন, একটা ভ্রান্তিমূলক সূচনা। একদিন এইটে সুন্দর, ছন্দোময়, আলোকপূর্ণ হয়ে উঠবে; কেননা সেই চরমপ্রাপ্তির জন্যই এর সৃষ্টি হয়েছে।

ভগবান অচেনা কেউ নন[২]

কিন্তু কেন এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীর মধ্যে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছেন?

কেননা সেইজন্যেই তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়; পৃথিবীটা হচ্ছে স্বয়ং তিনিই, তবে এটা বিকৃতরূপ ধারণ করেছে এবং তিনি চান এর উপর সত্যকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে। পৃথিবী ভগবান হতে আলাদা বা বিজাতীয় কিছু নয়। এইটি তাঁর অপকৃষ্ট রূপ এবং তা নিশ্চয়ই আবার লাভ করবে তার স্বরূপসত্য অর্থাৎ ভগবত্ত্ব।

তাহলে ভগবান আমাদের কাছে অচেনা হয়ে আছেন কেন?

কিন্তু তিনি তো অচেনা নন, বাছা! এটা তোমার খেয়ালী কল্পনা যে তিনি অচেনা, কিন্তু তিনি তা নন, একটুও নন। তিনি তোমার অস্তিত্বের মূলসত্তা— মোটেই বিজাতীয় নয়। তুমি তাঁকে না চিনতে পার, কিন্তু তিনি অচেনা নন, তিনি তোমার সত্তার সারাৎসার। ভগবান ব্যতীত তোমার অস্তিত্ব থাকত না। ভগবান ছাড়া এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের

এক ভাগ সময়কালও তুমি টিঁকে থাকতে পারতে না।

উৎস: ১: Cent. Edi. Vol. No. 3, PP. 102-03,
২: Cent. Edi. Vol. No. 7, P. 193, অনুবাদ: পীযূষ গুপ্ত

তিনি আছেন

শ্রীমা

ভগবান আছেন
সে জন্য এক ধরনের
কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা চাই...
সেইজন্যই জাগে এমন এক অপরূপ
কৃতজ্ঞতাবোধের অনুভূতি
যাতে সত্যসত্যই তোমার হৃদয়খানি
এক মহিমান্বিত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে...
এ বিপুল বিশ্বে
এমন কিছু রয়েছে যা ভগবান...
আমরা যা চাক্ষুস দেখি
তা দানবীয় মূর্তি
তা ঠিক নয় ...
ভগবান রয়েছেন
ভগবান আছেন এ এক জীবন্ত সত্য...
আর প্রতিবারই যে কোন সামান্য বস্তুই
তা সে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হোক না কেন
তোমাকে ভগবানের অস্তিত্বের
এক অপরূপ আনন্দের সংস্পর্শে নিয়ে আসে...
এ হৃদয়খানি
কী এক তীব্র আকুলতায় ভরে ওঠে
কী অপার এক আনন্দ জাগায়
নিয়ে আসে এক কৃতজ্ঞতাবোধ
আনে এমন এক আনন্দের স্বাদ
যার সঙ্গে অন্য কোন কিছুরই তুলনা মেলে না...

এ সংসারে এমন কিছু নেই
যার সঙ্গে কৃতজ্ঞতাবোধের
আনন্দের তুলনা করা যেতে পারে...
যখন তুমি শোন পাখির গান
তাকাও একটি সুন্দর ফুলের দিকে
চেয়ে দেখ ছোট্ট শিশুর মুখখানিকে
লক্ষ্য কর প্রত্যহের চলার পথে
কোন এক মহৎ ঔদার্যকে
পড়তে পড়তে যখন মিলে যায় একটি সুন্দর বাক্য
তাকাও অস্তায়মান সূর্যের দিকে
তা সে যে কোন জিনিসই হোক না কেন —
তখনই অকস্মাৎ এই জিনিস
তোমার কাছে এসে ধরা দেয়
হয়ত-বা সে এক ধরনের ভাবাবেগ
যা সত্যসত্যই গভীর আর সুতীব্র
এ সমস্তই তো ভগবানেরই প্রকাশ...
সমস্ত কিছুর অন্তরালে এমন কিছু রয়ে গেছে
যা ভগবান ছাড়া অন্য কিছু নয়।

অনুবাদ : কানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

প্রণত আমরা তোমার কাছে, এক হয়ে যাই তোমার সঙ্গে,হে ভগবান—এমন ভালবাসা নিয়ে যার নেই সীমানা, পরিপূর্ণ অনির্বচনীয় মহাসুখে।

দাও সকলকে এই পরম আনন্দ, হে ভগবান!

শ্রীমা

উৎস: *ধ্যান ও প্রার্থনা*, পৃ:১০৮, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা

(নির্বাচিত অংশ)

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২৪ নভেম্বর ২০২১-এর পর)

অতিমানসের অবতরণে বাধাবিঘ্ন

> প্র : এ কি ঠিক কথা যে অতিমানসের অবতরণ যতই নিকট হয়ে আসবে ততই যাদের মধ্যে প্রথমে তা ঘটবে তাদের পক্ষে বাধাবিঘ্নের মাত্রা বেড়ে যাবে?

উ : এটি সত্য, বাধাবিঘ্ন তাদের ছেড়ে দেবে না যদি না তারা মায়ের কাছে সেইরূপ সমর্পিত হয়ে, সেইরূপ চৈত্য ভাবাপন্ন ও নমনীয় হয়ে, অহংবর্জিত হয়ে থাকে।

*

নিজের বিপত্তির কথা ভেবো না, মায়ের হাতে ছেড়ে দাও, তাঁর শক্তি সব দূর করবে। ২২-৩-১৯৩৫

*

নালিশ বা প্রশ্নাদি ক'রে কোনো লাভ নেই। নীরবে থাকো, হতাশা বা ক্ষোভকে বাদ দিয়ে, মায়ের শক্তিকে গ্রহণ ক'রে তাকে কাজ করতে দিয়ে, বাধাবিঘ্নকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, নিজের দোষত্রুটির দিকে না চেয়ে, বিলম্বে অস্থির না হয়ে। ২৫-১০-১৯৩৩

*

হতাশা বা অসহিষ্ণুতাকে ঢুকতে দিও না। মায়ের শক্তিকে কাজ করতে সময় দাও। ১২-৬-১৯৩৭

*

দেহের শুদ্ধতা নিয়ে চিন্তা কোরো না। মায়ের প্রতি ভালোবাসাতে দেহকে ও হৃদয়কে শুদ্ধ ক'রে দেয়— অন্তরাত্মায় আস্পৃহা থাকলে দেহও শুদ্ধ। অতীতে যা হয়ে গেছে তাতে কিছু যায় আসে না।

*

তুমি ভালো হয়েছ আর 'ক' তোমাকে সাহায্য করেছে জেনে আমরা খুব খুশি। ঈর্ষা তার নিশ্চয় চলে যাওয়া চাই, একটুও যেন না থাকে। মায়ের প্রেম যে সর্বদাই তোমার প্রতি আছে এতে সন্দেহ কোরো না। তাঁর কৃপার উপর আস্থা রাখলে তোমার মধ্য থেকে এই সব কিছু অন্তর্হিত হবে আর মায়ের প্রকৃত সন্তান হয়ে থাকবে,যেমন আছো তোমার মনে ও হৃদয়ে। ১৮-৭-১৯৩৫

*

মা তোমাকে ত্যাগ করতে চান না, আর তুমি যে তাঁকে ছেড়ে যাবে তাও তিনি চান না। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলো তাহলেই সব ঠিক হবে। তাঁর ভালোবাসা তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে, তাঁর আশ্রয় বরাবর বজায় থাকবে।

সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। কাজের তাড়া নেই, আগে শক্তি আসুক।

১৯-৭-১৯৩৫

*

এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে উতলা হয়ে উঠো না। যে ক্রিয়ার আশংকা করছ তা যখন আসবে, তখন ধীর স্থির হয়ে নিজেকে খুলে রেখে মাকে ডাকতে থাকবে, কিছু পরে দেখতে পাবে যে একটা পরিবর্তন তোমার মধ্যে আসছে। ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়। সর্বদা মাকে চিন্তা করো, সব কিছু কাজ তাঁকে নিবেদন করো, আরো ভালো সাহায্য পাবে। ৭-৪-১৯৩২

বাহ্য ও আভ্যন্তর জিনিসের জন্য মাকে প্রার্থনা

> প্র : আপনি বলেন, "সাধক হলে সাধনার অন্তর্গত আভ্যন্তর জিনিসের জন্য এবং যেসব বাহ্য জিনিস ভগবৎ কার্যের পক্ষে দরকার তার জন্য প্রার্থনা করবে"। এই বাহ্য জিনিসের সম্বন্ধে কথাটা ঠিক বুঝিনি। দয়া ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

উ : সবই নির্ভর করছে যে সব বাহ্য জিনিসগুলি তুমি নিজের সুবিধার জন্য, নিজের সুখ ও লাভের জন্য চাও, কিংবা যেসব জিনিস তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তোমার কাজের সার্থকতার পক্ষে ও কাজের যন্ত্রগুলির সফলতার পক্ষে দরকার সেইগুলি চাও। এ হলো একটা মনোভাব গ্রহণের প্রশ্ন। যেমন মনে করো তুমি অর্থাদি প্রার্থনা করো সুস্বাদু খাদ্যবস্তু কেনবার জন্য, সেটা সাধকের পক্ষে সমুচিত নয়। যদি অর্থাদি প্রার্থনা করো মাকে ও মায়ের কাজে দেবার জন্য এবং তাঁর কাজের সাহায্যের জন্য, তাহলে সেটা ন্যায়সঙ্গত হবে তোমার পক্ষে। (ক্রমশ)

উৎস: ***On Himself,*** মূল অনুবাদক: পশুপতি ভট্টাচার্য

...“আমার কোন সন্তান ভয় পেতে পারে না।”...-শ্রীমা

ভয় সর্বদাই হচ্ছে এক অশুভ মন্ত্রণাদাতা।

*

কমবেশি সচেতনভাবে এই ভীতিই প্রায় সকলরকম অমঙ্গল করে বেড়ায়। ভীতি ভিন্ন অমঙ্গলকর *কিছুই* ঘটতে পারে না।

*

ভয় পেও না, নিজের উপর আস্থা রাখ, এই সব দুর্ভোগ তোমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ।

*

ভয় পাওয়া বন্ধ করলে বিরক্তিকর উদ্বিগ্নতাও বন্ধ হবে। আমার কোন সন্তান ভয় পেতে পারে না।
আশীর্বাদ।

*

আমার সুরক্ষা সর্বদা তোমার সাথে রয়েছে, আর অশুভ কিছু ঘটতে পারবে না। তবে অবশ্যই ভয়কে ঝেড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে, আর তখনই আমার শক্তি সম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারবে। ২৭ অক্টোবর ১৯৩৭

*

নিজেকে যন্ত্রণা দেবে না, উদ্বিগ্ন হবে না; সর্বোপরি সমস্ত প্রকার ভীতিকে বিতাড়িত করার প্রচেষ্টা কর; ভীতি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয় যা এমনকিছুকে গুরুত্ব দিতে পারে যাতে আদৌ সেরকম কিছু ছিল না। কয়েকটি মাত্র লক্ষণ দেখে অমূলক ভয় পেয়ে তাদের নতুন করে ডেকে আনা সেগুলির পুনরাবৃত্তি করার পক্ষে যথেষ্ট।
২৪ জুলাই ১৯৪৫

*

স্নায়বিক ও প্রাণিক দুর্বলতা হতে এই ভয়ের আবির্ভাব হয়। যোগের পথ অনুসরণ করার কোনরকম প্রচেষ্টায় উদ্যমী হওয়ার পূর্বে এই ভীতি থেকে অবশ্যই মুক্ত হবে।
৯ মার্চ ১৯৪৯

*

যোগসাধনা এবং ভয় একত্রে সঙ্গী হয়ে চলতে পারে না।

*

যে ভগবানের মধ্যে রয়েছে সে কিসে ভয় পেতে পারে? ভগবান তার জন্য যে-পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে-পথে তার আত্মা ক্রম-প্রসারমান এবং ললাট

আলোয় উদ্ভাসিত। সে কি হেঁটে এগিয়ে যেতে পারবে না, সে-পথ যেমনই হোক না, এমনকি তার সীমাবদ্ধ যুক্তির কাছে ধারণাতীত হলেও? ১৪ অক্টোবর ১৯৫২

*

সকল প্রকার ভীতিকে অবশ্যই পরাভূত করতে হবে এবং সেখানে প্রতিস্থাপন করতে হবে দিব্য করুণার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসকে। ৬ জুন ১৯৫৫

*

কোন কিছুতে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারে না যদি *তুমি ভয় না পাও*। সুতরাং, ভয় পাবে না, শান্ত এবং ধীর-স্থির হও— সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।
ভালবাসা ও আশীর্বাদ সহ ১৫ অক্টোবর ১৯৬৬

*

চিরকালের জন্য প্রথম যে জিনিসটি হতে অবশ্যভাবে তোমায় নিজেকে নিরাময় করে তুলতে হবে সেটি হচ্ছে *ভয়*।
মারাত্মক একটি রোগের তুলনায় এটি অনেক বেশি বিপজ্জনক।
ভালবাসা ও আর্শীবাদ সহ। ৯ অক্টোবর ১৯৬৭

*

ভয় পাওয়ার কিছু নেই— সমস্তই পরম প্রভু— পরম প্রভু ভিন্ন আর *কোনকিছু নেই*: একমাত্র পরম প্রভুই অস্তিমান এবং ওইসব যারা আমাদের ভীত করে তুলতে চায়, তা হচ্ছে পরম প্রভুরই এক অবোধ ও অর্থহীন গোপন রূপ।
উল্লসিত হও— উন্মুক্ত পথ রয়েছে তোমার সামনে, রোগব্যাধির এই আচ্ছন্নতাকে ঝেড়ে ফেলে দাও এবং নামিয়ে আন দিব্য প্রশান্তিকে।
তখন সকল কিছুই ঠিক হয়ে যাবে।
ভালবাসা ও আশীর্বদ সহ।

*

নির্বিঘ্নে সিদ্ধপুরে যাও এবং ভয় পাবে না।
একমাত্র ভয়ই যা অনিষ্ট করে বিদেহী সূক্ষ্মসত্তা নয়। যারা শরীর ত্যাগ করে চলে গেছে তারা তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে অবশ্যই তুমি ভয় পাবে না— এটির কারণ হলো সাধারণত তারা অস্থির ও অশান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে— তাদেরকে তুমি প্রেরণ কর এক শুভ অভিপ্রায় এবং আশা পোষণ কর যে তারা শান্তিতে থাকুক, আর তারপরেই এর অবসান ঘটবে।
যাই হোক না কেন, তাদেরকে তুমি মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য বলতে পার তাহলে তারা আর তোমাকে হয়রান করবে না।
সিদ্ধপুরে যাও এবং সেখানে যদি কোন অপ্রীতিকর সঙ্গ থাকে তবে এড়িয়ে যাবে,

কিন্তু সর্বসময়ে স্মরণে রাখবে যে একমাত্র ভীতিই অমঙ্গল করে আর দিব্য করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস সঙ্গে থাকলে তখন তুমি হচ্ছ নিরাপদ।

*

যখন তুমি তোমার মধ্যে থেকে সকল উগ্রতা দূর করে দিয়েছ তখনই একমাত্র তুমি ভীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারবে।

সকল প্রকার হিংস্রতা হতে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এস, তাহলে আর কখনও কোন ভয় থাকবে না।

*

ভীতি হচ্ছে লুকিয়ে-থাকা সম্মতি। কোন বিষয়ে যখন তুমি ভীত, তখন এর অর্থ হচ্ছে যে এটির সম্ভাবনাকে তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ এবং এভাবে তার হাতদুটোকে আরো শক্তিশালী করছ। বলা যেতে পারে যে এটি অবচেতনার এক স্বীকৃতি। ভীতিকে নানাভাবে অতিক্রম করা যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি পন্থা হলো সাহসিকতা, বিশ্বাস ও জ্ঞান।

*

ভীতি হলো দাসত্বের বন্ধন, কর্ম হলো মুক্তি, সাহসিকতা হলো বিজয়।

উৎস: *Words of the Mother*, Cent. Edi. Vol. No. 14, PP. 258-62,
অনুবাদ : অরুণ বসাক

...এই প্রশান্ত সূর্যোদয়ের সম্মুখে আমি — সব নীরব শান্তিময় আমার অন্তরে। এমন যে মুহূর্ত, তোমাতে সচেতন হয়ে উঠেছি আমি, একমাত্র তুমিই আমার মধ্যে। আমার বোধ হল জাহাজের সকল যাত্রীকে আমি গ্রহণ করেছি, সমান ভালবাসা দিয়ে তাদের ঘিরে রেখেছি, যাতে প্রত্যেকের মধ্যে তোমার চেতনার কিছু একটু জেগে উঠতে পারে। তোমার দিব্যশক্তি তোমার অজেয় জ্যোতি এত প্রবলভাবে প্রায়শঃ অনুভব করিনি—আর একবার অখণ্ড হয়ে উঠল আমার নিষ্ঠা, অমিশ্র আমার সানন্দ সমর্পণ।...

শ্রীমা

উৎস: *ধ্যান ও প্রার্থনা*, পৃ: ৫১, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

প্রার্থনা ও আস্পৃহা

শ্রীমা

প্রার্থনা আর আস্পৃহার মধ্যে তফাৎ কি?

এসম্বন্ধে আমি কোথাও লিখেছি। প্রার্থনা নানা ধরনের হতে পারে।

এটি হতে পারে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বা জড়স্তরের প্রার্থনা, কতগুলি মুখস্ত করা শব্দের সমষ্টি মাত্র এবং যন্ত্রের মত পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। এদের বিশেষ কোন মূল্য নেই। সাধারণত এই ধরনের প্রার্থনা থেকে কেবল একটিমাত্র ফল পাওয়া যায়, তা হল প্রার্থনাকারীকে শান্ত করে দেওয়া, যদি একটি প্রার্থনা বারবার উচ্চারিত হয় তবে শব্দগুলি শেষে তোমাকে নীরব করে দেবে।

এক রকমের প্রার্থনা আছে যা প্রার্থনাকারী ব্যক্তি যা পেতে চায় তার প্রকাশের যেন একটি স্বতঃস্ফূর্ত সংক্ষিপ্ত রূপ হয়ে ওঠে : কেউ প্রার্থনা করে এই জিনিস বা ঐ জিনিসের জন্য; কেউ-বা করে বিশেষ কোন একটি জিনিস লাভ করবার জন্য বা অন্য কিছু পাবার জন্য; কেউ-বা অন্য কারোর জন্য প্রার্থনা করতে পারে কিংবা কোন ঘটনার জন্য অথবা নিজের জন্যই প্রার্থনা করতে পারে।

এমন একটি স্তর আছে যেখানে আস্পৃহা আর প্রার্থনা মিলেমিশে এক হয়ে যায়, কারণ প্রার্থনা সেখানে হয়ে ওঠে একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ : সেগুলি যেন প্রায় সত্তার একেবারে অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়, যেন কোন গভীর অভিজ্ঞতার প্রকাশরূপ এবং সেই অভিজ্ঞতাটি লাভ করবার জন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা কিংবা সেই অবস্থাটি যাতে বজায় থাকে অথবা অবস্থাটির অর্থ যাতে বোধগম্য হয় তার জন্যও প্রার্থনা হতে পারে; এবং তা অবশ্যই আস্পৃহারই সম্পূর্ণ কাছাকাছি হয়ে থাকে। কিন্তু আস্পৃহার ভাষায় রূপ পরিগ্রহণ করবার কোন প্রয়োজন হয় না; যদি-বা তা ভাষায় রূপায়িত হয়, তা যেন হয়ে ওঠে আবাহনের গতিময়তা। তুমি কোন একটি বিশেষ অবস্থা লাভ করবার জন্য আস্পৃহা কর; যেমন নিজের মধ্যে তুমি এমন কিছু দেখতে পেয়েছ, যা তোমার আদর্শের অনুরূপ মোটেই নয়, কোন একটি অজ্ঞান বা অন্ধকারের ক্রিয়া, এমন কি হয়তো-বা কোন অসৎ ইচ্ছার প্রবৃত্তি, এমন কিছু যার সঙ্গে তুমি যা অর্জন করতে চাও তার কোন সামঞ্জস্যই নেই; তখন আস্পৃহা ভাষায় রূপায়িত হবে না; তা হয়ে উঠবে একটি ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতো এবং একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতার উৎসর্গের মতো, তা যেন আরও বৃহৎ হয়ে উঠতে চায়; তার আয়তন আরও বৃদ্ধি পায় এবং আরও আরও বেশি করে পরিষ্কার এবং যথাযথ হয়ে ওঠে। এ সবই ''পরে'' ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখা যায়, যদি কেউ তার অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে

এবং লিখে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু আস্পৃহা সর্বদা শিখার আকারে উত্থিত হয় যা ঊর্ধ্বের দিকে উঠে চলে আর তার মধ্যে বহন করে সেই বস্তুকে যা একজন হতে চায় অথবা করতে চায় অথবা লাভ করতে চায়। আমি ''চাওয়া'' শব্দটি ব্যবহার করলাম, কিন্তু সত্যসত্যই এখানে ''আস্পৃহা'' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। কারণ আস্পৃহার মধ্যে চাওয়ার ভাব বা আকার নেই।

সত্যিই আস্পৃহা হল ইচ্ছাশক্তির এক বৃহৎ বিশুদ্ধ শিখা এবং সে তার অন্তঃস্থলে বহন করে সেই বস্তুকে যা অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে।

ধর, তুমি এমন একটি কাজ করে বসেছ যা করে ফেলার জন্য তুমি অনুতাপ করছ, তার দরুন অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা বিশৃঙ্খলা তৈরী করেছে এবং অনেক লোক এতে জড়িয়ে পড়েছে, তুমি অন্যদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জান না, কিন্তু তুমি নিজে চাইছ যে যা হয়ে গেছে তা যেন একটা ভালর দিকে ঘুরে যায়, আর যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তা যেন বুঝতে পারা যায়, আর সেই ভুল যাই হোক না কেন, তা যেন তোমার কাছে একটি মহত্তর প্রগতির, মহত্তর শৃঙ্খলার, দিব্যের দিকে এক নতুন ভাবে উঠে যাওয়ার একটি সুযোগ হয়ে ওঠে, যেন তুমি যেমন চাও, আরও নির্মল, আরও সত্যময় এবং আরও সুতীব্র তেমনই এক ভবিষ্যতের দিকে দরজা খুলে যায়; তখন সেই সব কিছু এইখানে (মা তাঁর হৃদ্‌কেন্দ্রটির দিকে ইঙ্গিত করলেন) একটি শক্তির আকারে একত্রিত হয়, এবং তারপর ঊর্ধ্বের দিকে আলোড়িত হয়ে ওঠে এবং তা এক বিপুল বেগের সঙ্গে ঊর্ধ্বারোহণ করে এবং কখন কখন তার মধ্যে কোন কিছু রূপায়ণের ছায়ামাত্র থাকে না, কোন কথা, কোন অভিব্যক্তি কিছুই না, থাকে শুধু এক ঊর্ধ্বমুখী শিখা।

এই হল যথার্থ আস্পৃহা। এরকম অবস্থা দিনে একশ বার, হাজারবার হতে পারে, যদি কেউ এমন অবস্থায় থাকে যে সে অনুক্ষণ উন্নতি করতে চায় এবং দিব্য ইচ্ছা আমাদের জন্য যা চান সেই ইচ্ছার প্রতি আরও সত্যপরায়ণ এবং পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

প্রার্থনা হল অনেক বেশী বাইরের জিনিস, সাধারণত তা একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্বলিত, এবং প্রার্থনা সবসময় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। একজনের অন্তরে হয়ত একটি আস্পৃহা জেগে উঠতে পারে এবং সেটিকে সে প্রার্থনার আকারে রূপ দিতে পারে, কিন্তু আস্পৃহা সব দিক থেকেই প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে যায়। আস্পৃহা হল অনেক নিকটতম এবং যেন অনেক বেশী আত্মবিস্মৃত, যা কিছু একজন হয়ে উঠতে চায় বা যা কিছু করতে চায় এ যেন হল শুধু আস্পৃহার মধ্যে বাস করা এবং ভগবানের প্রতি তার সমস্ত কিছু নিবেদন সে সবই হল আস্পৃহা। তুমি কোন কিছু চাইবার জন্য প্রার্থনা করতে পার, ভগবান তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করেও তুমি প্রার্থনা করতে পার। আর সে প্রার্থনা হবে অনেক বেশী উচ্চস্তরের : তাকে ভগবানের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনকরা বলা যেতে পারে। ভগবান তোমার জন্য যে করুণা প্রদর্শন করেছেন, তিনি তোমার জন্য যা কিছু করেছেন, তাঁর মধ্যে তুমি যা দেখ এবং তুমি তাঁর প্রতি যে স্তুতি নিবেদন করতে চাও, এ সকল কিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তুমি প্রার্থনা করতে পার। এ সব কিছুই প্রার্থনার আকার নিতে পারে। এ হল নিঃসন্দেহে উচ্চতম প্রার্থনা, কারণ এর মধ্যে কোন ব্যক্তিসত্তা থাকে না, এ কোন অহঙ্কার প্রসূত প্রার্থনা নয়।

অবশ্যই একজনের সত্তার প্রতিটি স্তরে আস্পৃহা থাকতে পারে, কিন্তু আস্পৃহার কেন্দ্রবিন্দু হল চৈত্যপুরুষের মধ্যে, যেখানে একজন সত্তার সকল স্তরেই প্রার্থনা করতে পারে এবং যে স্তর থেকে সে প্রার্থনা করেছে প্রার্থনাটি সেই স্তরেরই হবে। একজন খাঁটি জড়গত বা শারীরস্তরের প্রার্থনা করতে পারে, প্রাণেরস্তরের প্রার্থনা করতে পারে, মনেরস্তরের প্রার্থনা করতে পারে, চৈত্যিক প্রার্থনা করতে পারে, আধ্যাত্মিক প্রার্থনা করতে পারে এবং প্রত্যেকটিরই রয়েছে তার বিশেষ চরিত্র এবং বিশেষ মূল্য।

একরকমের প্রার্থনা আছে, যা একই সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিঃস্বার্থ, যেন একটি বৃহৎ আহ্বান, সাধারণত তা ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য নয়, বরং তাকে যা বলা যেতে পারে তা হল ভগবানের কাছে মধ্যস্থতা করা। এ প্রার্থনার শক্তি প্রচণ্ড। এই ধরনের প্রার্থনার ফলে নিমেষের মধ্যে ফললাভ হয়েছে, এমন অগণিত দৃষ্টান্ত আমি পেয়েছি। এর জন্যে নিজের অন্তরে নিহিত থাকা চাই সুগভীর বিশ্বাস, তীব্র আকুলতা, গভীর নিষ্ঠা, আর হৃদয়ের মাঝেও অতিমাত্রায় অকপটতা থাকা চাই, এমন কিছু যা হিসেব করে না, পরিকল্পনা করে না, দরদস্তুর করে না বা বিনিময়ে কিছু পাবার আশায় কোন কিছু দেয় না। কেননা বেশীরভাগ মানুষেরা এক হাতে দেয় এবং অন্য হাতটা কিছু পাবার জন্য বাড়িয়ে দেয়; বেশীরভাগ প্রার্থনাই হল এই ধরনের। কিন্তু আবার অন্য ধরনের প্রার্থনাও আছে, যেগুলির সম্বন্ধে আমি বলেছি, ভগবানের কাছে ধন্যবাদজ্ঞাপন করা, এক রকমের স্তুতিগান বিশেষ। খুবই ভাল সেগুলি।

যাক, এই হল ব্যাপার। জানি না কতখানি পরিষ্কার করতে পারলাম, কিন্তু বিষয়টি হল এই রকম।

আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, আমরা বলতে পারি যে প্রার্থনা সবসময় ভাষার মাধ্যমে রূপায়িত হয় এবং যে অবস্থায় তাকে রূপদান করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে প্রার্থনার মূল্য বিভিন্ন হতে পারে। প্রার্থনা হল একটি রূপায়িত বস্তু এবং একজন তা আস্পৃহাও করতে পারে। কিন্তু কোন একজনের কাছে করা না হলে প্রার্থনা করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, জগৎ-সংসার সম্বন্ধে যারা এমন মত পোষণ করে যে সেখান থেকে তারা ভগবানের সম্পর্কে ধারণাকে কম বেশী বিতাড়িত করে দিয়েছে

(এই ধরনের লোক সংখ্যায় অনেক রয়েছে; এই ধারণা তাদের বিব্রত করে তোলে— এমন ধারণা যে কেউ একজন আছেন যিনি সবকিছু জানেন, সব কিছু করতে পারেন এবং যিনি তাদের তুলনায় এতই বিরাট ভাবে শ্রেষ্ঠ যে তার কোন তুলনাই হতে পারে না; এটা তাদের আত্মমর্যাদার পক্ষে কিছুটা অসুবিধাজনক; সেইজন্য তারা ভগবানকে ছাড়াই একটা জগৎ তৈরী করতে চেষ্টা করে)। এই ধরনের লোকেরা স্পষ্টতঃই প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ কার কাছে তারা প্রার্থনা করবে? যদি না তারা নিজেদের কাছে নিজেরাই প্রার্থনা করে, আর তেমনটা করার কোন রীতি নেই! কিন্তু একজন ভগবানের প্রতি তার কোন বিশ্বাস না থাকলেও যেকোন কিছুর জন্য আস্পৃহা করতে পারে। এমন লোক আছে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু জীবনের উন্নতি সাধনে তাদের বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এই ধারণা রয়েছে যে পৃথিবী ক্রমাগত উন্নতির পথে চলেছে এবং এই উন্নতির ধারা কখনও না থেমে এক চিরায়ত মহত্তর প্রগতির অভিমুখে অনির্দিষ্ট কাল অবধি চলতে থাকবে। এখন এইসব লোকেদের উন্নতি লাভের জন্য একটি খুবই মহৎ আস্পৃহা থাকতে পারে এবং তার জন্য তাদের কোন দিব্যসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমনকি কোন ধারণা থাকবারও দরকার নেই। আস্পৃহার মধ্যে স্বভাবতঃ একটি বিশ্বাস নিহিত রয়েছে কিন্তু অবশ্যই কোন দিব্যসত্তার উপর বিশ্বাস নয়; যেখানে প্রার্থনা যদি কোন দিব্যসত্তার উদ্দেশ্যে না করা হয়, তাহলে সেই প্রার্থনার কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। আর কার কাছে প্রার্থনা করবে? যার কোন ব্যক্তিসত্তা নেই তেমন কোন কিছুর কাছে কেউ প্রার্থনা করে না। যিনি আমাদের কথা শুনতে পারেন, তাঁর কাছেই একজন প্রার্থনা করে। যদি আমাদের প্রার্থনা শোনবার জন্য কেউ না থাকেন, তাহলে কিভাবে একজন প্রার্থনা করবে? কাজেই, যদি কেউ প্রার্থনা করে, তার অর্থ হল, এমনকি সে যদি তা স্বীকার নাও করে যে তার এমন কারোর উপর বিশ্বাস রয়েছে যিনি আমাদের থেকে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, অনন্তগুণে শক্তিশালী, যিনি আমাদের অদৃষ্টকে পরিবর্তিত করতে পারেন এবং আমাদেরও বদলাতে পারেন, যদি কেউ তাঁকে শোনাবার মত করে প্রার্থনা করতে পারে। এই হল মূলগত তফাত।

তাই বেশী মননশীল লোকেরা আস্পৃহাকে স্বীকার করে এবং বলে যে প্রার্থনা হল আস্পৃহার তুলনায় কিছুটা অধোগত। অতীন্দ্রিয়বাদীরা বলেন যে আস্পৃহা খুবই ভাল জিনিস, কিন্তু যদি তুমি সত্যিই তোমার কথা শোনাতে চাও এবং চাও যে ভগবান তোমার কথা শুনুন, তাহলে তুমি অবশ্যই প্রার্থনা করবে, আর প্রার্থনা করবে একটি শিশুর মতো সরলতা নিয়ে, যথার্থ অকপটতার সঙ্গে অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করতে হবে : ''আমার এটা দরকার কিংবা ওটা (সেটা কোন নৈতিক প্রয়োজনই হোক বা শারীরগত প্রয়োজন হোক বা কোন ব্যবহারিক স্থূল প্রয়োজনই হোক), আমি তোমার কাছে এটি চাইছি, এটি আমাকে দাও।'' অথবা বলবে ''তোমার কাছে আমি

যা চেয়েছি, তা তুমি আমাকে দিয়েছ, যেসব অভিজ্ঞতা আমার কাছে অজানা ছিল সে সবের দৃঢ়মূল ভিত্তি তুমি এনে দিয়েছ এবং পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আমি আমার ইচ্ছা পোষণ করার সাথে সাথে সে অবস্থা লাভ করতে পারছি; হ্যাঁ আমি তোমার কাছে অনন্তগুণে কৃতজ্ঞ এবং আমি তোমার স্তুতি-গান করবার জন্য তোমার কাছে নিবেদন স্বরূপ একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রার্থনা করছি এবং তোমার হস্তক্ষেপের জন্য তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'' এইভাবে প্রার্থনা করতে হয়। আস্পৃহার ক্ষেত্রে, আস্পৃহাকে কারোর প্রতি বা কারোর অভিমুখে পরিচালিত করা প্রয়োজনীয় নয়। কারোর মধ্যে আস্পৃহা জাগে তার সত্তার কোন একটি বিশেষ অবস্থার জন্য, জ্ঞানের জন্য, উপলব্ধির জন্য, চেতনার কোন একটি অবস্থার জন্য; যে কোন কিছুর জন্য একজনের আস্পৃহা জাগতে পারে, কিন্তু এটি স্বভাবতঃই কোন প্রার্থনা নয়; প্রার্থনা হল একধরনের সংযোগকারী বস্তু।

প্রার্থনা হল একটি ব্যক্তিগত বস্তু, যা কোন একজন ব্যক্তিসত্তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, কোন কিছুর উদ্দেশ্যে— কোন একটা শক্তি কিংবা কোন সত্তার উদ্দেশ্যে— যিনি তোমার কথা শুনতে পারেন এবং উত্তর দিতে পারেন। তা না হলে তুমি তো কিছুই চাইতে পারবে না। তোমরা বুঝতে পেরেছ?

উৎস : *Questions and Answers,* Cent. Edi. Vol. No. 5, PP. 141-45,
অনুবাদ : দেবযানী সেনগুপ্ত

অন্তরের সম্বন্ধ অর্থ, তুমি অনুভব কর মায়ের সান্নিধ্য, সদা সর্বদা তাঁরই দিকে ফিরে রয়েছ, তুমি বুঝতে পার তাঁরই শক্তি তোমাকে চালায়, পথ দেখায়, সাহায্য করে, তাঁর উপর ভালবাসা তোমায় পূর্ণ রেখেছে, সর্বদাই বোধ কর তুমি তাঁর একান্ত নিকটে রয়েছ, স্থুলত নিকটে থাক বা না থাক। এ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় মনে, প্রাণে এবং আন্তর স্থূল অবধি—শেষে তুমি অনুভব কর তোমার মন মায়ের মনের সন্নিকটে, তোমার প্রাণ মায়ের প্রাণের ছন্দে বাঁধা, তোমার স্থূলচেতনা পর্যন্ত তাঁরই স্থূল চেতনায় পরিপূর্ণ।

শ্রীঅরবিন্দ

উৎস: *মাতৃবাণী*, পৃ:৮০, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

শান্তি ও স্থিরতা

শ্রীমা

কাজ করা নিয়ে ভুল ধারণা[১]

উদ্বিগ্নতা, তাড়াহুড়ো, চঞ্চলতা— এসব দিয়ে কিছু হয় না। এসব শুধু সমুদ্রের উপরকার ফেনা; এসব আড়ম্বরের সমাপ্তি তার নিজের সঙ্গেই। মানুষের একটা ধারণা আছে যে যদি তারা সর্বদা ছুটোছুটি না করে, উত্তেজিত অবস্থায় কাজকর্মে ব্যস্তসমস্ত হয়ে না পড়ে, তাহলে তারা কিছু করছে না। এটা একটা ভুল ধারণা যে এইসব তথাকথিত কর্মব্যস্ততা কোন কিছু পরিবর্তন করতে পারে। এ যেন এক বাটি জল নিয়ে তাকে বারে বারে আঘাত করা; জল চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু তোমার শত আঘাতেও তার কোন পরিবর্তন হয় না। মনুষ্যস্বভাবের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণাগুলোর মধ্যে এই কাজ করার ধারণাটি একটি। এতে প্রগতি ব্যাহত হয় কেননা উত্তেজনাপূর্ণ কোন কাজে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজনবোধ তোমার ওপর এসে পড়ে। যদি শুধু তুমি এর ভুলটা বুঝতে পারতে, কিরকম নিরর্থক এইসব, এতে যে কিছুই বদলায় না! এর দ্বারা তুমি কোথাও কিছু লাভ করতে পার না। যারা এইভাবে ছুটে বেড়ায় তারা সেইসব শক্তির যন্ত্রের মতো হয় যেসব শক্তি নিজেদের মজার জন্য তাদের নাচায়। আর এইসব শক্তিরা খুব উঁচু জাতেরও নয়।

জগতে যা কিছু করা হয়েছে, তা খুব কম সংখ্যক লোকের দ্বারা হয়েছে এবং এঁরা কাজের বাইরে নীরবতার মধ্যে স্থিতি নিতে পারতেন। কারণ এঁরাই হচ্ছেন সেইসব ব্যক্তি যাঁরা ভগবৎশক্তির যন্ত্র। তাঁরা হচ্ছেন কর্মকুশল প্রতিনিধিস্বরূপ, সচেতন যন্ত্র; তাঁরা শক্তি নামিয়ে এনে জগতের পরিবর্তন আনেন। এইভাবেই কাজ করা যায়, ছুটোছুটি ক'রে নানা কর্মে ব্যাপৃত থেকে নয়। শান্তির মধ্যে, নীরবতার মধ্যে, স্থিরতার মধ্যে জগৎটা নির্মিত হয়েছে, আর প্রতিবার যখনই একটা সত্যিকারের কিছু নির্মাণ করা দরকার, সেই শান্তি, নীরবতা এবং স্থিরতার মধ্যেই করতে হবে। এই কথা ভাবা একটা অজ্ঞানতা যে জগতের জন্য কিছু করতে হলে তোমাকে সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত দৌড়তে হবে এবং যতরকম তুচ্ছ জিনিস নিয়ে পরিশ্রম করতে হবে।

শান্ত থাকতে শেখ[২]

যত সব কথা, মাথার যত সব ভাবনার কোলাহলে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। আর অবস্থা এমন যে তুমি সেই সত্য শুনতে পাবে না, যখন সে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইবে।

শান্ত ও চুপ ক'রে থাকা যদি শিখতে হয়... কোন সমস্যার সমাধান করার সময়, সমাধানের সবরকম সম্ভাবনা মাথার ভেতর গিজ্‌গিজ্ করতে না দিয়ে— কি তোমার করা উচিত, কি করা উচিত নয় সবরকম সম্ভাব্য কথা চিন্তা না ক'রে, তুমি যদি শান্ত থাক একটা সদিচ্ছার জন্য আস্পৃহা নিয়ে, অথবা আরও ভাল, সদিচ্ছার প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে, তাহলে সমাধান খুব তাড়াতাড়ি আসে। আর যেহেতু তুমি নীরব অবস্থায় আছ, তুমি তা শুনতে পাও।

যখন তুমি কোন ঝামেলায় পড়ে যাও, এই উপায়টা চেষ্টা ক'রে দেখ: উত্তেজিত হয়ে, সবরকম বুদ্ধি খেলিয়ে সক্রিয়ভাবে সমাধান খোঁজার বদলে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিরক্তচিত্ত হয়ে মাথার মধ্যে এখানে সেখানে ছুটোছুটি করার বদলে— আমি বাইরে ছুটোছুটি করার কথা বলছি না, কেননা সম্ভবতঃ তোমার যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে তা না করার জন্য— কিন্তু ভেতরে, তোমার মাথায় স্থির থাক। আর তোমার প্রকৃতি অনুযায়ী, উৎসাহসহকারে কিংবা শান্তিতে, তীব্রতা নিয়ে অথবা বিস্তৃতির সাহায্যে কিংবা সবগুলোরই সঙ্গে উচ্চ আলোর জন্য আহ্বান করো এবং সেটা আসার জন্য অপেক্ষা কর।

এইভাবে রাস্তা অনেক ছোট হয়ে যেতে পারে।

উৎস:১:Cent. Edi. Vol. No. 3, PP. 66-67,
২: Cent. Edi. Vol. No. 9, PP. 423-24, অনুবাদ : পীযূষ গুপ্ত

ভগবান সবকিছুই করে দিতে পারেন—এই যেমন, হৃদয় ও প্রকৃতির শুদ্ধীকরণ, অন্তশ্চেতনার উদ্বোধন, যতকিছু যবনিকাজালের নিরাকরণ, সব, সব কিছুই—যদি তুমি শুধু সশ্রদ্ধ বিশ্বাসে নিজেকে ভগবানের কাছে সঁপে দিতে পার। প্রথম-প্রথম যদিই-বা তুমি এটি পুরাপুরি না করতে পার, তবু যে পরিমাণে তুমি এটি করতে পারবে, সে পরিমাণেই তোমার কাছে আসবে আন্তর নির্দেশ ও সহায়তা, আর ভগবানের অনুভূতি-উপলব্ধিও তোমার মধ্যে গড়ে উঠবে।...এটি ছাড়া তখন আর অন্য কোন শক্তি বা তপস্যার প্রয়োজনই ঘটে না।

শ্রীঅরবিন্দ

উৎস: *পূর্ণযোগের সাধন পদ্ধতি* : যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড,পৃ:৫

..." চিন্তা মানুষকে শাসন করছে, মানুষ চিন্তাকে নয়।" ...

— শ্রীমা

মা, কখনো কখনো মনের মধ্যে আকস্মিক নানা ভাব জেগে ওঠে, কোথা থেকে আসে তারা, কি করেই-বা আমাদের মাথায় কাজ করে?

কোথা থেকে আসে?— মনের রাজ্য থেকে।

কেন তারা আসে?— পথ চলতে হয়তো দেখা হয়ে যায় তাদের সঙ্গে, রাস্তাঘাটে যেমন কোন পথিকের সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে; ভাবটি তখন তোমার মাথায় ঢুকে পড়ে। স্বভাবতঃ যারা ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত, যাদের কাছে তত্ত্বজিজ্ঞাসা পুরোপুরি বাস্তব বলে, শরীরী বলে, প্রতিভাত হয়, তারা একাগ্রচিত্তে যত আনুষঙ্গিক ভাবধারাকে আকর্ষণ করে। এইভাবে একটি "ভাবসংঘ" গড়ে ওঠে। তারপর কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে, কোন উত্থাপিত প্রশ্নের উপর আলোকপাত করতে হলে, তারা সেই ভাবপুঞ্জকে সুসংবদ্ধভাবে প্রয়োগ করে। কিন্তু এরকম করতে পারার জন্য মনকে একাগ্র করবার অভ্যাস থাকা চাই, আর চাই দার্শনিক মননশীলতা যার কথা আগেই তোমাদের বলেছি। দার্শনিক মনের কাছে ভাবসমূহ জীবন্ত সত্তা, তাদের আছে স্বতন্ত্র জীবনধারা। মননশীল মানুষ ভাবগুলিকে দাবার বোড়ের মতো ছকের উপর সাজিয়ে রাখে। তারা ভাবগুলিকে এখান থেকে ওখানে সরায়, ওখানে রাখে, এভাবে বিন্যাস করে, তাদের নিয়ে এক সুসঙ্গত সংহতি রচনা করে। তারা জানে প্রত্যেকটি ভাব পৃথক স্বাধীন সত্তা, পরস্পরের মধ্যে যদিও কুটুম্বিতা আছে। তারা সুসম্বন্ধ হয় আন্তর নিয়মের প্রেরণায়। কিন্তু এমন দার্শনিক মন পেতে হলে ধ্যান মনন বিশ্লেষণ অনুমান ও বুদ্ধিতন্ত্রে অভ্যস্ত হওয়া চাই। নইলে যেমন-আছি-তেমনি-থাকব কিংবা যা-হবার-হবে করে চললে, সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে প্রকাশ্য জনপদের মতো হয়ে দাঁড়ায়— কত রাস্তা চলেছে, রাস্তার উপর কত চিন্তার যাতায়াত! তুমি চৌরাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। তোমার মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল চিন্তা, কখনো কখনো এমন চিন্তা আসে যাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সঙ্গতিই নেই; তখন তোমার মস্তিষ্কে যে-সব ভাবনার উদয় হয় সে-সব লিখে ফেললে অদ্ভুত একটা আষাঢ়ে গল্প হবে।

একবার একটা ছোট খেলার কথা তোমাদের বলেছিলাম। খেলাটা বেশ শিক্ষাপ্রদ। হঠাৎ কাউকে জিজ্ঞেস কর, "কি ভাবছ?" দেখবে বেশিরভাগ লোকই স্পষ্ট উত্তর দিতে পারবে না, বলতে পারবে না, "আমি এখন অমুক বিষয়ে চিন্তা করছিলাম।" কেউ যদি স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে তাহলে বুঝবে লোকটি চিন্তাশীল।" কিন্তু সাধারণত দেখা যায় কেউ যদি সরাসরি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে সেই উত্তর হবে, "ও! আমি জানি না।"

এই ধর, যারা সুনির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দৈহিক ব্যায়াম করেছে তারা জানে কোন্-কসরতের সময় কোন্ কোন্ পেশীর চালনা করতে হবে। তারা পেশী চালনার উৎকৃষ্ট উপায়ও জানে; জানে কি করে ন্যূনতম শক্তি ব্যয় করে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যায়। চিন্তার ক্ষেত্রেও একই কথা রীতিমতো অভ্যাস করলে এমন একটা সময় আসে যখন কোন যুক্তি আমরা একান্ত নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন করতে পারি— যুক্তিটি যেন পর্দার উপর একটি ছবির মতো। অনুধাবন করতে পারি এক তত্ত্ব থেকে আরেক তত্ত্বের ন্যায়সিদ্ধ পরিণতি। এবং অযথা সময় ব্যয় না করে আমরা একটি বিবৃতির স্বাভাবিক ন্যায়সিদ্ধ নিয়ন্ত্রিত যাত্রাও শুরু থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারি। দেহ-চর্চায় সুফল পাবার জন্য যে পেশীগুলোকে চালিত করবার দরকার সেগুলিকে যেরকম বিধিমতো চালিত করবার অভ্যাস করি, চিন্তার ব্যাপারেও সেরকম করে অভ্যাস করলে চিন্তা স্বচ্ছ হয়। তা না হলে চিন্তার ও বুদ্ধির গতিধারা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ভাসাভাসা থেকে যায়। হঠাৎ কি যেন ভেসে ওঠে কেন কে জানে! পরের মুহূর্তে অন্য কিছু আসে প্রতিবাদ করতে, তা-ই-বা কেন আসে কে জানে! তারপর আমরা যদি সেই চিন্তাপুঞ্জকে সাজাবার চেষ্টা করি, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝবার জন্য, তাহলে গোড়ার দিকে রীতিমতো মাথা ধরে যায়। মনে হয় আমরা বুঝি ঘোর অন্ধকার অজানা অরণ্যে পথ খুঁজে ফিরছি।

দার্শনিক মনের বিকাশের জন্যও চাই সাধনা। মনকে বিধিমতো শিক্ষা না দিলে তোমার বোধ হবে তুমি যেন সর্বদা বাস করছ এক কুয়াশার জগতে। বেশির ভাগ মানুষই মাথার মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবনাচিন্তা ধরে রাখে কিন্তু তাতে তারা এতটুকুও অস্বস্তি বোধ করে না।

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বুদ্ধিবৃত্তিকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা না করবে ততক্ষণ ভাবনার উপর তোমাদের কোন আধিপত্য না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। আর তোমার চিন্তার সত্যিকারের মূল্য কি তা প্রায়ই বোঝা যায় তখনই যখন সেই চিন্তা কর্মে রূপ নিতে চেষ্টা করে। কর্ম অবধি না গেলেও অন্তত অনুভব অবধি : হঠাৎই দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে এমন সব অনুভব জাগে যেগুলি মোটেই কাম্য নয়, আর তখনই তুমি বুঝতে পার যে চিন্তা করার প্রণালীর উপর তোমার এখনো অধিকার লাভ হয়নি।

মা, মনের উপর আধিপত্য নেই বলেই কি কারো কারো মনে খারাপ চিন্তা জাগে?

খারাপ চিন্তা?... নানা কারণ থাকতে পারে তার। আসলে, অনেকগুলি কারণ আছে। খারাপ চিন্তা আসতে পারে খারাপ চরিত্র থেকে— কারো প্রবৃত্তি নীচ হলে তা নীচ চিন্তার হেতু হতে পারে। অনরকমও দেখা যায়। কারো কারো অন্তর এক উন্মুক্ত ভূমি। সেখানে বাইরে থেকে সব রকমের ধারণা সঞ্চারিত হচ্ছে। আর একথা তোমাদের

আগেও বলেছি, সেইসব ধারণা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করে খারাপ চিন্তা-ভাবনা। আবার, অবচেতনার জগতে নিয়মের নিগড়হারা যেসব শক্তিরাজি পরস্পর বিবাদ করছে তাদের প্রভাবের ফলেও এমন হওয়া সম্ভব। অবচেতনার শক্তিগুলি যখন উপরে ভেসে ওঠে তখন তাদের মধ্যে যেগুলি অবাঞ্ছিত তাদেরও বাধা দেওয়া হয় না, ফিরিয়ে দেওয়া হয় না; সবগুলি ঢুকে পড়ে ইচ্ছেমতো খোলা দরজা দিয়ে।

আমরা ডুবে আছি ভাল-মন্দের মধ্যে, আলো-অন্ধকারের বা আলো-আঁধারির মধ্যে। এইসব আমাদের ঘিরে আছে। আসলে আমাদের চেতনার কাজ করা উচিত এক একটি ছাঁকনির মতো। যা গ্রহণ করতে চাই তা-ই শুধু গ্রহণ করব, যা ভাবতে চাই তা-ই শুধু ভাবব, এবং এ যেন কোনমতেই না হয় যে চিন্তা ধারণা বিধিবৎ অনুমতি না পেয়ে অনুভবে বা কর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মূলত এ-ই হল পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য। এক একটি শক্তিপুঞ্জ এক এক জনের কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করছে। আর প্রত্যেক মানুষ এক একটি যন্ত্র যার কাজ হল সেই শক্তিপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের শুধু সেই শক্তিগুলিকেই গ্রহণ করা উচিত যেগুলি ভগবৎ-বিধানের অনুবর্তী, বাকিগুলিকে বর্জন করা উচিত।

কিন্তু কোটিতে গুটিকও করে না। কেউ কেউ একটু আধটু চেষ্টা করে, খুব যে সচেতনভাবে তা-ও নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর পরিবেশের পীড়নে। কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় করার কথা বল, তাহলে দেখা যায় খুব অল্প লোকই তা স্বেচ্ছায় করে। আর যারা স্বেচ্ছায় করেও তাদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া কঠিন যে শুধু স্বেচ্ছায় নয় অধিকন্তু সত্যকার জ্ঞানে সত্যভাবে এই চেষ্টা করে।

চিন্তার সংযম! ক'জন চিন্তাকে সংযত করতে পারে? কেবল তারাই পারে যারা সংযম শিক্ষা করেছে, যারা শৈশব থেকে সংযমের অভ্যাস করেছে।

নানা স্তর আছে। নিম্নতম স্তরে সংযমের একান্ত অভাব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তখন দেখা যায়, চিন্তা মানুষকে শাসন করছে, মানুষ চিন্তাকে নয়। অধিকাংশ লোকই চিন্তায় বিব্রত, তারা চিন্তা থেকে রেহাই পায় না। তারা সত্যসত্যই চিন্তাগ্রস্ত। চিন্তাগুলির মুখের উপর সজাগ চেতনার দ্বার বন্ধ করে দেবার শক্তি তাদের নেই। চিন্তারাই তাদের শাসন করে, তাদের উপর করে আধিপত্য। এ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার যে লোকেরা বলে, ''উঃ! চিন্তাটা বারবার ফিরে ফিরে আসছে, কিছুতেই রেহাই পাচ্ছি না!'' অর্থাৎ দুশ্চিন্তা থেকে শুরু করে অসূয়া ভীতি পর্যন্ত নানা রিপুর আক্রমণে তারা ব্যতিব্যস্ত। বিপদের ভয় মানুষকে একেবারে নাজেহাল করে মারে। বিপদের চিন্তাকে তুমি হঠিয়ে দিতে চেষ্টা কর, দেখবে রবারের বলের মতো ছিটকে ফিরে এসে আবার তোমার উপরই পড়বে। সংযম কার আছে? সংযমের জন্য চাই বহু বছরের

সাধনা, বহু দিনের অভ্যাস। প্রথমে পূর্ণ সংযম লাভ হয় না। তুমি পৌঁছও এমন একটি প্রাথমিক স্তরে যখন সব চিন্তা স্পন্দনকে এইভাবে এইভাবে ঝেড়ে ফেলবার *(শ্রীমা হাত দিয়ে কপাল থেকে সবকিছু মুছে ফেলবার ভঙ্গি করেন)*, চিন্তার সব আনাগোনাকে থামিয়ে দেবার ক্ষমতা আসে তোমার মনের মধ্যে। তখন মনের বহির্ভাগ নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। সব কিছু থেমে যায়— বই-এর একটা শূন্য পাতা খুললে, একান্তই বাস্তবে যেন; বুঝলে... সাদা।

বাড়িতে গিয়ে একটুখানি চেষ্টা কর, দেখবে ব্যাপারটা খুবই চমৎকার।

মাথার মধ্যে যেখানে ক্ষুদ্র চিন্তাবিন্দুটি নেচে চলেছে তাকে অনুসরণ করতে হয়। আমি শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছি অন্য একজনের মাথার মধ্যে এইভাবে অনুসরণ করতে। লোকটি অভিযোগ করছিল নানা চিন্তাভাবনা তাকে বিব্রত করছে। শ্রীঅরবিন্দ যেন হাত বাড়িয়ে সেই কালো চঞ্চল বিন্দুটিকে এইভাবে ধরে (*শ্রীমা দু আঙুলে কিছু টিপে ধরার ভঙ্গি করলেন*) দূরে ফেলে দিলেন, লোকে যেভাবে পোকামাকড় ধরে দূরে ফেলে দেয়। ব্যাস্, আর কিছু নয়। পুরোপুরি নিশ্চল, শান্ত, জ্যোতির্ময়।... স্পষ্টই দেখতে পেলাম সমস্ত ব্যাপারটা। তিনি কিছু না বলে বিন্দুটি ধরলেন— তারপর সব শেষ।

অনেক কিছুই ঠিক এই ধরনের : আমি একজন লোককে দেখেছি। সে শ্রীঅরবিন্দের কাছে এল; দারুণ একটা ব্যথা তার শরীরের কোথাও : ''উঃ এখানে ব্যথা! উঃ কী ব্যথা!'' ...শ্রীঅরবিন্দ কিছু বললেন না, স্থির হয়ে বসে রইলেন। লোকটির উপর দৃষ্টি ফেললেন। দেখতে পেলাম, সূক্ষ্ম শরীরের একটি হাত এসে সেই ব্যথার ক্ষুদ্র বিন্দুটিকে ধরে ফেলল। বিন্দুটি এতক্ষণ বিভ্রান্ত বিশৃঙ্খলভাবে লাফালাফি করছিল। তিনি সেটিকে এইভাবে ধরলেন (আগের মতো ভঙ্গি) আর দেখতে না দেখতে সব অদৃশ্য।

''আরে, আমার ব্যথাটা নেই তো।''

আজ এ পর্যন্তই থাক্।

উৎস: Cent. Edi. Vol. No. 10

এটা নিশ্চিত জানবে যে আমি সর্বদাই তোমাদের মধ্যে আছি তোমাদের কাজে এবং তোমাদের সাধনায় পথ দেখাতে ও সাহায্য করতে।

শ্রীমা

উৎস:*Mantras of the Mother* গ্রন্থের অনুবাদ: মন্ত্রমালা,পৃ:৩,
অনুবাদ: পীযুষ গুপ্ত

..."এই চেতনা শুধু মানুষেই নেই; আছে বিশ্বের সবকিছুর মাঝে"... —শ্রীমা

বুধবার, ৫ই মার্চ ১৯৫২

আজ Prayers পড়ার দিন। শ্রীমা পড়লেন দুটি ধ্যানলিপি ২৪শে ও ২৫শে মে, ১৯১৪। তারপর শিশুদের পড়া হলে, প্রশ্ন করার পালা।...

দ্বিতীয় ধ্যানলিপিটি সম্বন্ধে শ্রীমা বললেন, এটা বুঝতে পারা সহজ হবে এই কথাটি মনে রাখলে যে বিশ্বময় একই চেতনার লীলা চলছে। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে তা তার অহংকারের দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে নানা আকার নিয়েছে। এই সীমাবদ্ধ ছোট্ট অহংবোধকে অতিক্রম করে যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে সবের সঙ্গে, তারপর সবের ওপরে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ রয়েছে তার সঙ্গে, সে হয়ে ওঠে সব, এবং তারপর সে হয়ে ওঠে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই হল নিয়ম। সারা বইখানিতে আমি সেই মিলনের কথাই বলেছি। এই অখণ্ড একত্ববোধ শুধু যে সম্ভব তা নয়, এ হল স্বাভাবিক। এই চেতনা শুধু মানুষেই নেই, আছে বিশ্বের সবকিছুর মাঝে। আছে চন্দ্র সূর্য গ্রহতারকার মাঝে, আছে গাছপালা পশুপক্ষীর মাঝে, আছে দেশ, জাতি, নদী পাহাড়ের মাঝে। উদাহরণ নাও যেমন ভারতবর্ষ। কি এবং কোনটা সেটা? কোন বিশেষ একটা অংশকে বা সেখানকার লোকদের বা সেখানকার জিনিসপত্র গাছপালাকেই তো তোমরা ভারতবর্ষ বল না! ভারতবর্ষ বল একটা সমগ্রকে নিয়ে। সেইটাই হল তার আত্মা আর তার আছে এক বিশেষ চেতনা— তার অভিব্যক্তি নানাভাবে নানা লোকের ও নানা বস্তুর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। সেটা বিশেষভাবে বিশেষ চেতনার অভিব্যক্তি।

এই বইয়ে অবশ্য আমার মূল ধ্যানলিপিটি দেওয়া হয়নি। সেটি শুধু শ্রীঅরবিন্দকেই দিয়েছিলাম। একদিন আমি ধ্যান করতে করতে বাহ্যচেতনার সীমা অতিক্রম করে বিশ্বচেতনার সঙ্গে মিলিয়ে গেলাম। আমার সমগ্র দেহ যেন হয়ে উঠল এক গোলাকার পদার্থ, ঠিক পৃথিবীর আকারে। ঘণ্টাখানেক এই অবস্থায় কাটল। আমি তখন বিশ্বের সকল বস্তুর, সকল মানুষের, সকল জীবের স্পন্দন অনুভব করছিলাম। তাদের আস্পৃহা আমার মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল। তার খানিকটা বিবরণ দেওয়া আছে এই ধ্যানলিপিটিতে যে পশুপক্ষী এবং গাছপালার পর্যন্ত অভীপ্সা আমার অভীপ্সার সঙ্গে মিলে এক হয়ে গেল।...

*

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২

"পার্থিব যত আপেক্ষিক বস্তু" বলতে কি বোঝাচ্ছ?

শ্রীমা : এই পৃথিবীতে যেখানে যা আছে সবকিছুই আপেক্ষিক অর্থাৎ প্রত্যেকটিরই কার্য ও কারণ সুনির্দিষ্ট। প্রতেকটিই অন্যগুলির সঙ্গে অতিশয় নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। এমন কোন ভাব বা ভাবনা নেই, কোন কাজ চিন্তা প্রতিক্রিয়া নেই, যার অস্তিত্ব আগেই বিশ্বচেতনাতে নেই বা যা অন্যদের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ কোন পদার্থ নেই, কোন ক্রিয়া নেই।

সমগ্র বিশ্বের এই রূপ প্রতি মানুষেরই অন্তরে বিরাজমান। তাই যখন মানুষ বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করে, তখন সে দেখে যে এখানে সবকিছুই একই ধারায় চলেছে, একই রকম যেন। কেবল আকারেই তারা বিভিন্ন, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সব সংযুক্ত। মানুষ তখন প্রত্যক্ষ করে যে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম একটি কণাকেও, অনু-পরমাণুকেও বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারা যায় না, সমগ্র বিশ্বকে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল না করে। এখানে প্রত্যেক বস্তু যে যেমনটি, সে তেমনটি ছাড়া অন্যরকম কিছু হতে পারে না। তার কারণ সবকিছুই এখানে এক অখণ্ড অপরিবর্তনীয় নিয়মে বাঁধা। সে নিয়ম হল পারস্পরিক নির্ভরতার বিধান।

এই পৃথিবীকে ছেড়ে মানুষ তার বাইরে যেতে পারে কি?

শ্রীমা: অবশ্যই পারে। তবে দেহ সমেত নয়, দেহ বাদে; চেতনার ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই সম্ভব, একেবারে মূল উৎসে গিয়ে মানুষের চেতনা পৌঁছতে পারে।

উৎস: মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় রচিত: ***শ্রীমায়ের পাঠশালা***

জীবনের পথে সকল ভীতি সঙ্কট বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে যদি বর্ম্মাবৃত হয়ে চলতে চাও, তবে কেবল দুটি জিনিস প্রয়োজন—সে দুটি সর্ব্বদাই এক সঙ্গে রয়েছে—প্রথম, মা ভগবতীর করুণা, আর দ্বিতীয়, তোমার দিক থেকে শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-সমর্পণে গঠিত তোমার অন্তঃকরণ।

শ্রীঅরবিন্দ

উৎস: *The Mother*,পৃ:১৩, অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত, মূল বানান অপরিবর্তিত।

শিক্ষা

শ্রীমা

মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত একেবারে তার জন্ম থেকে আর চলা উচিত সারা জীবন ধরে।

সত্য কথা বলতে কি, শিক্ষার পরিপূর্ণ ফল পেতে হলে জন্মের আগে থেকেই তার শুরু করা উচিত; এক্ষেত্রে এই শিক্ষা আরম্ভ হয় মায়ের মধ্যে দুই ধারার ক্রিয়ায় : প্রথম, তার নিজের সম্বন্ধে নিজের উন্নতি নিয়ে; দ্বিতীয়, যে শিশুকে সে নিজের ভিতরে অবয়ব দান করছে তাকে নিয়ে। একথা ধ্রুব সত্য যে, যে-শিশুটি জন্মগ্রহণ করতে চলেছে তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করবে তাকে রূপদান করছে যে মা তার উপর, মায়ের আকাঙ্খা ও সঙ্কল্প আর যে-জাগতিক পারিপার্শ্বিকীর মধ্যে মা বাস করে তার উপর। মায়ের শিক্ষা যা দরকার তা হল তার চিন্তা সব যেন হয় সর্বদা সুন্দর ও নির্মল, অনুভবও সব সুন্দর ও মহৎ, আর চারিদিকের জাগতিক পরিবেশ হবে যথাসম্ভব সুসমঞ্জস, একটা মহান সরলতায় পরিপূর্ণ। এর সঙ্গে সে যদি রাখতে পারে তার মহত্তম আদর্শ অনুসারে শিশুটিকে গড়ে তোলবার জন্য সচেতন ও সুনির্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তি, তাহলে শ্রেষ্ঠতম সম্ভাবনা নিয়ে শিশুটির এই পৃথিবীতে আসার সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হল। এরকমে কত পণ্ডশ্রম আর নিরর্থক জটিলতারই না অবসান হতে পারে।

শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে হলে মানবসত্তার পাঁচটি প্রধান বৃত্তি অনুযায়ী তারও পাঁচটি প্রধান বিভাগ থাকা দরকার; শারীরিক, প্রাণিক, মানসিক, হৃদাত্মিক এবং আধ্যাত্মিক। সাধারণত, শিক্ষার এই পর্যায়গুলি ব্যক্তির ক্রমপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে চলে একের পর একটি করে; তবে তার অর্থ নয় যে একটির স্থান অন্যটি এসে অধিকার করবে, বরং সব ক'টিই একসঙ্গে চলবে— একে অন্যকে পরিপূর্ণ করে, জীবনের শেষ পর্যন্ত।

আমরা এখানে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার এই পাঁচটি দিক এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করব। বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনার পূর্বে আমি পিতামাতাদের কাছে একটা সুপারিশ করতে চাই। নানা কারণে তাঁদের অধিকাংশই পুত্রকন্যাদের যে সুশিক্ষা দিতে হবে সে বিষয়ে সামান্যই চিন্তা করেন। একটি শিশুকে এই পৃথিবীতে এনে, তাকে অন্ন দিয়ে, তার সুস্বাস্থ্যের দিকে কমবেশি লক্ষ্য রেখে, তার কতকগুলি স্থূল দাবী মিটিয়েই তাঁরা মনে করেন তাঁদের কর্তব্য সম্পূর্ণ করা হল। পরে তাকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তার মানসিক শিক্ষার দায়িত্ব তাঁরা শিক্ষকদের উপর চাপিয়ে দেন।

অবশ্য এমন পিতামাতাও আছেন যাঁরা বোধ করেন তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা পাওয়া উচিত এবং এজন্য চেষ্টাও করেন। কিন্তু অল্প কয়েকজনই, এমনকি যাঁদের

দায়িত্ববোধ আছে, আন্তরিকতা আছে তাঁদের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই, জানেন যে সন্তানকে শিক্ষা দেবার যোগ্য হতে হলে আগে শিক্ষিত হতে হয় নিজেকে, নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়, আত্মজয়ী হতে হয়, যাতে সন্তানের সম্মুখে তাঁকে তুলে না ধরতে হয় কুদৃষ্টান্ত। কারণ দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা তাই হয় বিশেষ কার্যকরী। শিশুকে ভাল ভাল কথা বলে, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে বেশি ফল হয় না, যদি না শিক্ষক সেই শিক্ষার দৃষ্টান্ত কাজে দেখাতে পারেন। আন্তরিকতা, সততা, ঋজুতা, সাহস, অনাসক্তি, নিঃস্বার্থতা, ধৈর্য, সহ্যশক্তি, অধ্যবসায়, শান্তি, স্থিরতা, আত্মসংযম, এসব জিনিস মনোরম বক্তৃতার পরিবর্তে কার্যত দেখালে অনেক ভাল। জনক-জননী, রাখ উচ্চ আদর্শ আর সর্বদা সেই আদর্শ অনুসারে কাজ কর। দেখবে একটু একটু করে তোমাদের সন্তানের অন্তরে এই আদর্শ ফুটে উঠছে, তার মধ্যে যে-সব গুণের বিকাশ দেখতে চাও তুমি সে-সব স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়ে চলেছে। শিশুর পক্ষে পিতা-মাতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক; একেবারে অপদার্থ না হলে তারা সর্বদাই তাদের সন্তানদের চোখে দেবতুল্য, যথাসাধ্য অনুকরণের যোগ্য।

অল্পসংখ্যককে বাদ দিলে, বেশিরভাগ পিতামাতারাই জানেন না যে তাঁদের ত্রুটি, চঞ্চলতা, দুর্বলতা, আত্মসংযমের অভাব, সন্তানদের উপর কতখানি মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদি তোমার সন্তানের কাছে শ্রদ্ধেয় হতে চাও তাহলে নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখ, প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধা যোগ্য হয়ে ওঠ। কখনো কর্তৃত্বপ্রয়াসী, স্বৈরাচারী, অধীর, রিপুর বশ হবে না। তোমার সন্তান যখন তোমায় কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তখন তোমার কথা বুঝতে পারবে না এই অজুহাতে বোকামিপূর্ণ অর্থহীন উত্তর দিও না। যদি একটু কষ্ট কর তবে কিছুই বোধগম্য করান অসম্ভব নয়; আর 'সবসময় সত্যকথা বলা ঠিক নয়' এই প্রবাদবাক্য চলতি থাকা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই যে সত্যকথা বলা সর্বদাই ভাল, তবে এমনভাবে বলা দরকার যাতে তা শ্রোতার বোধগম্য হয়। জীবনের গোড়ার দিকে, বারো থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিশুমন তত্ত্ব এবং ব্যাপক সত্য ধরতে পারে না। তবে প্রত্যক্ষ উপমা, প্রতীক অথবা রূপকের সাহায্যে সে-সব তাকে বুঝান যেতে পারে। খানিকটা বয়স পর্যন্ত এবং যারা মনে চিরকাল শিশুই থেকে যায় তাদের কাছে একটা বর্ণনা, সুকৌশলে কথিত একটা গল্প, একটা কাহিনী, একরাশি তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেয়ে বেশি অর্থ বহন করে।

আর এক বাধা অতিক্রম করতে হবে। বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এবং একেবারে অপরিহার্য না হলে সন্তানকে তিরস্কার ক'রো না। যে ছেলে সর্বক্ষণ তিরস্কার পায় তিরস্কারে সে অসাড় হয়ে পড়ে, শেষে কটুকথা এবং কঠোর স্বরকে বড় একটা মূল্যও দিতে চায় না। বিশেষ করে, যে দোষ তুমি নিজে কর তার জন্য তাকে তিরস্কার ক'রো না। শিশুরা অত্যন্ত সতর্ক এবং স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন : তোমার দুর্বলতাগুলি অল্পক্ষণের

মধ্যেই তারা ধরে ফেলে এবং নির্মমভাবে সেগুলি লক্ষ্য করে।

কেউ যখন একটা ভুল করে, দেখো সে যেন তা তোমার কাছে নিজের থেকেই অকপটে স্বীকার করে, আর সে যখন একবার স্বীকার করেছে তখন তাকে সহানুভূতি এবং সহৃদয়তার সঙ্গে বুঝিয়ে দাও কোথায় তার ভিতরে ভুল হয়েছিল এবং আর যেন সে তার পুনরাবৃত্তি না করে; কিন্তু তিরস্কার ক'রো না কখনো, দোষ স্বীকার করলে ক্ষমা আছেই। তুমি এবং তোমার সন্তানের মাঝখানে ভয় যেন প্রবেশ না করে। ভয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া সর্বনাশকর : তার অনিবার্য ফল আত্মগোপন এবং মিথ্যাচার। অন্ধ নয় এমন স্নেহ, দৃঢ় অথচ কঠোর নয় এবং যথাসাধ্য ব্যবহারিক জ্ঞান তোমার ও তোমার সন্তানের মধ্যে সেই অপরিহার্য বিশ্বাসের সম্বন্ধটি গড়ে দেবে যা ব্যতীত তার শিক্ষা কিছুই কার্যকরী হবে না। আর কখনো ভুলো না তোমাকে সর্বদা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে হবে যাতে তোমার কর্তব্যের সামনে উঠে দাঁড়াতে পার, সন্তানের উপর তোমার দায়িত্ব নির্বাহ করতে পার— তাকে তুমি পৃথিবীতে এনেছ সেই হেতুই যে দায়িত্ব।

উৎস : *বুলেটিন* (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১), মূল ফরাসী থেকে অনূদিত,
অনুবাদ : সমীরকান্ত গুপ্ত

ভগবান, তোমার সম্মুখে আমি অনেকক্ষণ নীরব হয়ে ছিলাম অন্তরে নিজেকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়ে, জ্বলন্ত আরাধনায় পূর্ণ হয়ে, পরম একাত্মতার জন্যে উন্মুখী হয়ে।...চিরদিন যেমন, তুমি আমায় বললে : ''পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কর।'' আমি দেখলাম পথ সব উদার উন্মুক্ত, প্রশান্ত বিশুদ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত।

মূক আরাধনায় মগ্ন হয়ে, তোমার ইচ্ছাতে ওতপ্রোত হয়ে, আমি পৃথিবীর দিকে ফিরে দাঁড়ালাম।

শ্রীমা

উৎস: *ধ্যান ও প্রার্থনা*, পৃ:১৬১,অনুবাদ: নলিনীকান্ত গুপ্ত

যোগপথের বাধাবিঘ্ন

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২৪ নভেম্বর ২০২১-এর পর)

প্রকৃতির মধ্যেকার অহংবোধ, বাসনা, ভ্রান্তিগুলি সকলের মধ্যে খুব বেশী মাত্রায় একই হয়ে থাকে। কিন্তু একবার যখন একজন সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করে এবং তার মধ্যে যদি ঐগুলি থেকে মুক্ত হয়ে উঠবার জন্য সঙ্কল্পশক্তি নিহিত থাকে, তখন তাকে কেবলমাত্র ঐ সঙ্কল্পশক্তিকেই ধরে রাখতে হবে এবং আর কোন সত্যকার বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা যখন একজন তুমি যেভাবে সচেতন হতে শুরু করেছ সেভাবেই সচেতন হতে আরম্ভ করে এবং ভিতরকার কিছু যা সব লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল সে সমস্তকে উত্থিত করে তোলে, তখন তার অর্থ হল এই যে শ্রীমায়ের কৃপা তোমার প্রকৃতির উপর রয়েছে এবং তাঁর শক্তি এখন কাজ করে চলেছে, আর সেইসঙ্গে এই সমস্ত কিছু হতে মুক্তিলাভ করবার জন্য তোমার আন্তরসত্তা শ্রীমায়ের শক্তিকে সাহায্য করছে। কাজেই তুমি অবশ্যই বিষণ্ণ অথবা নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে না কিংবা কোনকিছুকে ভয় করবে না বরং যা কিছু বাইরে বেরিয়ে আসছে তাদের সকলের দিকে দৃঢ়তার সঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে এবং এর সাথে তোমার মাঝে থাকবে সেই সঙ্কল্প যে এগুলি সম্পূর্ণভাবে বিদায় নেবে এবং তা চিরদিনের জন্যই। শ্রীমায়ের শক্তির ক্রিয়া এবং তারসঙ্গে সেই শক্তিকে চৈত্যপুরুষের সহায়তার ফলস্বরূপ সবকিছুকেই সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং সকলকিছু নিশ্চিতভাবেই সংসিদ্ধ হয়ে উঠবে। বিশুদ্ধিকরণটিকে এই উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয় যাতে ভবিষ্যতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে না পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে কেননা তাদের প্রকৃতি শুদ্ধ অবস্থায় ছিল না — আর বিশুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হল যাতে উচ্চতর চেতনা এক শুদ্ধ প্রকৃতির মাঝে নেমে আসতে পারে এবং আন্তর রূপান্তর নির্বিঘ্নে সংঘটিত হয়। কাজেই বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সেইসঙ্গে শ্রীমায়ের উপর তোমার আস্থাকে অর্পণ করে এগিয়ে চল।

*

তুমি এখানে যা কিছু লিখেছ তা সর্বতোভাবে সঠিক। ব্যাপারটি সেইরকমই, এই সমস্ত শক্তিগুলির থেকে পিছনে সরে দাঁড়িয়ে, না তাদের প্রতি আকর্ষিত হয়ে, না তাদের দ্বারা আলোড়িত হয়ে একজন মুক্তিকে লাভ করে থাকে, শক্তিগুলির মিথ্যা অথবা অসম্পূর্ণতাকে সে অনুভব করে এবং সেগুলির ঊর্ধ্বে উঠে যেতে এবং তাদের জয় করতে সমর্থ হয়ে ওঠে। যে চেতনাটি সম্মুখভাগে আসছে তা হয় চৈত্যিক অথবা তা আধ্যাত্মিক মন হতে পারে — সম্ভবতঃ প্রথমে উল্লেখিতটি।

*

শ্রীমা যা বলেছেন তা আত্ম-বিশ্লেষণ নতুবা সূক্ষ্মবিচার নয়; সে সমস্ত হল মনোময় বিষয় যা অচেতন পদার্থের সাথে আদান-প্রদান করতে অথবা সজীব বস্তুকে মৃতে পরিণত করতে পারে — সেগুলি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া নয়। শ্রীমা যা বলেছেন তা বিশ্লেষণ নয়, বরং সেটি হল নিজের প্রতি এবং সত্তার সকল প্রাণবন্ত গতিবৃত্তিসমূহ ও প্রকৃতির প্রতি এক নিরীক্ষণ, আমাদের সত্তার রঙ্গমঞ্চে যারা উপস্থাপনা করে সত্তার সেই বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং শক্তিসমূহের দিকে এক সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, তাদের নানা উদ্দেশ্য, তাদের প্রবৃত্তিসমূহ, তাদের বিভিন্ন সম্ভাবনা, অর্থাৎ এমন এক পর্যবেক্ষণ যা সম্পূর্ণরূপে ততখানি আকর্ষণীয় ঠিক যেমন একটি নাটক অথবা একটি নভেলকে দেখা ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারাটি, এ হল কিভাবে বিভিন্ন বিষয়গুলি আমাদের মাঝে সম্পন্ন হচ্ছে তারই এক জীবন্ত দর্শন এবং বোধ, যা এই আন্তর বিশ্বের উপর এক সজীব আধিপত্যকেও নিয়ে আসে। ঐ ধরনের বিষয়গুলিকে এইভাবে প্রত্যক্ষরূপে এবং বোধিগতভাবে জীবনের এক গতিবৃত্তি হিসেবে না দেখে যখন একজন ঐগুলির সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক ও যুক্তিশীল মনের সাহায্যে আদান-প্রদান করে, কেবলমাত্র তখন সেগুলি শুষ্ক হয়ে ওঠে। যদি তোমার মাঝে সেই নিরীক্ষণ থেকে থাকে (আন্তর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বাহ্য বুদ্ধিগত ও নীতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নয়), তাহলে তুলনামূলকভাবে তোমার পক্ষে সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসাটি সহজ হবে; উদাহরণস্বরূপ, মুহূর্তের মধ্যেই তুমি আবিষ্কার করবে যে এই অযৌক্তিক প্রবৃত্তিটি যাকে ত্বরিত বেগে দৌড়ে পলায়ন করতে হবে সেটি ঠিক কোন স্থান থেকে এসেছিল এবং তোমার উপর এটির আর কোনরকম অধিকার থাকবে না। অবশ্যই, সর্বোৎকৃষ্ট কার্যফলের জন্য সবকিছু যা করা যেতে পারে তা হল যখন তুমি তোমার প্রকৃতির খেলা থেকে সরে গিয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াবে এবং সাক্ষী নিয়ন্ত্রক কিংবা তার দর্শক-অভিনেতা-ম্যানেজার হয়ে উঠবে। কিন্তু সেটি ঘটবে যখন তুমি এই ধরনের আত্ম-নিরীক্ষণের অবস্থানটিকে গ্রহণ করবে।

ব্যাপারটি শুষ্ক অথবা বেদনাপূর্ণ হয়ে উঠবে এই ভয়টি হল অবিবেচনাপূর্ণ বুদ্ধির একটি ধারণা। (ক্রমশ)

উৎস : *Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, pp. 1693-95,
অনুবাদ : দেবযানী সেনগুপ্ত

প্রাণের রূপান্তর

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২৪ নভেম্বর ২০২১-এর পর)

এটি (সকলের প্রতি নমস্কার জানান) হল একটি অনুভূতি যা এমন অনেকের মধ্যেই রয়েছে যারা হয় বিনম্রতার অনুশীলন করতে চায় (যেমন 'ক' সর্বদা এমনটি করতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমি কখনও দেখিনি যে এর দ্বারা সে তার স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-সমাদর করা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে) অথবা যাদের মধ্যে এই উপলব্ধিটি রয়েছে কিংবা এর সঙ্গে একটি বৈষ্ণবভাব নিয়ে সকলের মধ্যে নারায়ণের উপলব্ধিকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করছে। সকলের মাঝে সেই পরম এককে অনুভব করা হল সঠিক কাজ, কিন্তু যে ব্যক্তি এখনও পর্যন্ত তার অহং-এর মধ্যেই বাস করছে তার কাছে প্রণত হওয়া না সেই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলকর না সেই লোকটির পক্ষে যে এই কাজটিকে সম্পাদন করছে। এই ক্রিয়াটি এক বিশ্বজনীন অনুভূতি যা যোগপথের একটি পদক্ষেপ মাত্র তার তুলনায় বিশেষকরে এই যোগের ক্ষেত্রে যাকে সংহত এবং এক উচ্চতর উপলব্ধির অভিমুখে পরিবর্তিত করে তুলতে হবে তাকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরী করে।

*

সম্ভবতঃ একজন একথা বলতে পারে যে আধ্যাত্মিক বিনম্রতা হল যা কিছু সম্পন্ন করা হয়েছে তার তুলনায় যা এখনও করে তুলতে হবে তাদের মধ্যেকার যে সম্বন্ধ সে বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠা— সেইসঙ্গে এই ব্যাপারেও সচেতন থাকা যে ভগবৎ-কৃপা ব্যতিরেকে একজন কোনকিছুই হতে পারে না।

*

শ্রেষ্ঠত্বের বোধের বিষয়ে কিছু বলতে হলে, যখন বিস্তীর্ণ দিগন্ত চেতনার সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে ওঠে তখন সেই বিষয়টিকে এড়িয়ে চলা একটু কঠিন হয়ে পড়ে, যদি না একজন ইতোমধ্যেই এক সাধুসুলভ এবং বিনীতভাবের মানুষ হয়ে থাকে। নাগ মহাশয়ের (শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবর্গের মধ্যে অন্যতম) মতো এমন অনেকে রয়েছেন যাঁদের মাঝে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ক্রমশ আরও বেশী করে বিনয়ের সৃজন করেছিল; আবার অনেক মানুষ রয়েছেন যেমন বিবেকানন্দ, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যাঁর মাঝে শক্তি ও বিশিষ্টতার এক বিশাল বোধকে সৃষ্টি করেছিলে— ইউরোপীয়ান সমালোচকগণ এই নিয়ে তাঁকে কিছুটা তীব্রভাবেই নিন্দা করেছে; এছাড়াও অন্যান্য অনেকে রয়েছেন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যাঁদের ক্ষেত্রে মানুষদের মধ্যে বিশিষ্টতার বোধ এবং ভগবানের প্রতি বিনীতভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছিল। প্রত্যেকটি অবস্থারই নিজস্ব মূল্য রয়েছে।

এক্ষেত্রে মাদ্রাজী পণ্ডিতকে বলা বিবেকানন্দের বিখ্যাত উত্তরটিকে হৃদয়ঙ্গম কর, যে তাঁর কোন একটি বাক্যের সুদৃঢ় ঘোষণাটিকে খণ্ডন করে বলেছিল : ''কিন্তু শঙ্কর এমন কথা বলেননি।'' এর জবাবে বিবেকানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন : ''না বলেননি, কিন্তু আমি বিবেকানন্দ, সেই কথাই বলি'', এবং সেই পণ্ডিত তখন বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই ''আমি, বিবেকানন্দ,'' সাধারণ দৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ অহং-এর এক হিমালয়রূপেই সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে কোনরকম ভ্রান্তি এবং অগভীরতার উপস্থিতি ছিল না। কেননা এ শুধুমাত্র অহংবাদ নয়, তিনি যার উপরে দণ্ডায়মান ছিলেন এ ছিল তারই বোধ এবং সেই যোদ্ধার মনোভঙ্গী যিনি, কোনকিছু যা খুবই মহত্তর তারই প্রতিনিধিরূপে, নিজেকে অবনমিত অথবা নিজের মর্যাদাহানি করতে পারেন না। এটি অহংশূন্যতা এবং আধ্যাত্মিক বিনম্রতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা নয়, বরং সেটিকেই প্রমাণ করা যে প্রশ্নটিকে প্রথম দৃষ্টিতে যেমন দেখাচ্ছে সেটি ততখানি সোজা নয়। কেননা যদি আমাকে আমার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে আমি অবশ্যই সেই কাজটি সত্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করব— আমি অবশ্যই সেগুলিকে গভীরভাবে স্মরণে রাখব, তাদের ভাবকে, তাদের সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি, চেতনার ব্যাপ্তিকে যেগুলি সেই উপলব্ধিগুলির অংশস্বরূপ সহবর্তমান থাকে। সেইসমস্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলিকে নিয়ে আমি কি করব যেখানে একজন নিজের মাঝে সমগ্র বিশ্বকে অথবা সত্তার মাঝে ভগবানের শক্তির প্রবাহকে অনুভব করে এবং সকল সন্দেহ ও সন্দেহকারীদের বিরুদ্ধে তার নিজের বিশ্বাসের প্রকৃতি অথবা নিঃসন্দিগ্ধতাকে কিংবা ভগবানের সঙ্গে তার একত্বকে অথবা এই বিশালতর জ্ঞান ও অস্তিত্বের তুলনায় মানবীয় চিন্তা ও জীবনের ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করে? আর আমাকে ''আমি'' শব্দটিকে ব্যবহার করতে হবে— বিশেষকরে যেহেতু আমি একজন মায়াবাদী নই, কাজেই আমি ''এই দেহ'' অথবা ''এই অবয়ব'' বলবার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি না। আমি তা করব না, কাজেই প্রকাশ বা অভিব্যক্তির মধ্যে নেমে আসব যা 'ক'কে আমার কথা গর্ব এবং অহং-এ পরিপূর্ণ ধরে নিয়ে তার মাথাটিকে নাড়িয়ে তুলবে? আমি কল্পনা করে দেখছি যে এটি থেকে নিবৃত্ত হওয়াটি কঠিন হয়ে উঠবে।

আরেকটি বিষয় : আমার মনে হয়েছে যে তুমি বিশ্বাসকে বড় বেশী মাত্রায় মানসিক বিশ্বাসের সঙ্গে এক করে ফেলেছ, কিন্তু যথার্থ বিশ্বাস হল এমনকিছু যা আধ্যাত্মিক, তা হল অন্তরাত্মার মধ্যস্থিত জ্ঞান। তুমি যে বাক্যগুলিকে তোমার চিঠির মধ্যে উদ্ধৃত করেছ সেগুলি হল মানসিক বিশ্বাসের সুদৃঢ় দাবি যা একজনের মানসিক ধর্মমত ও লক্ষ্যের এক বিশাল উদ্দীপ্ত ঘোষণার দিকে নিয়ে যায় কেননা সেগুলি হল তার নিজস্ব, অতএব অবশ্যই অন্যদের তুলনায় মহত্তর— এ হল এমনই এক মনোভঙ্গী যা মানবীয়

প্রকৃতিতে বিশ্বজনীন। এমনকি নিরীশ্বরবাদীরাও সহিষ্ণু নয়, কিন্তু সে প্রকৃতি ও জড়ের সম্পর্কে তার বিশ্বাসকে একমাত্র সত্যরূপে ঘোষণা করে এবং সেইসঙ্গে যারা সেটিকে অবিশ্বাস করে অথবা যারা অন্য কোনকিছুতে বিশ্বাস পোষণ করে তাদের সবার উপরে অনালোকিত অপরিণত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধের ন্যায় অশ্রদ্ধাকে ঢেলে দেয়। আমার সম্পর্কে সেই ধরনের ধারণার জন্য তার ব্যাপারে আমি কোনরকম অসন্তোষ পোষণ করি না, বরং আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এই মনোভঙ্গী কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, এ ব্যতীত সেটি যারা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুক্ত এবং ভগবান অথবা গুরুকে বিশ্বাস করে না তাদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে স্বাভাবিক। আমি আশা রাখি যে তুমি তেমনটি করবে না, প্রশ্নটির অন্যদিকটি সম্পর্কে আমার উপস্থাপনাটিকে মনে রেখো; আমি এটিকেই নির্দেশ করতে চাই যে অন্য দিকটিরও উপস্থিতি রয়েছে, অর্থাৎ প্রথম দৃষ্টিতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তার থেকেও অনেক বেশী কিছু বলবার মতো বিষয় রয়েছে।

*

যথার্থ মনোভঙ্গীটি হল এটি দেখা যে একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে, অহং-এরই মতো, একজনের কিছুমাত্র গুরুত্ব নেই এবং তার নিজস্ব বাসনা, গর্ব, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির উপর বেশীরকম আগ্রহ প্রকাশ করা হল একটি অজ্ঞানতা, বরং একজন গুরুত্বপূর্ণ হল শুধুমাত্র এক চিৎপুরুষ হিসেবে, অর্থাৎ ভগবানের এক অংশরূপে, তার অতিরিক্ত অন্য কিছু নয়, যেমন সকল অন্তরাত্মাই সকলের অন্তরাত্মার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

*

এগিয়ে থাকা সাধকদের সম্বন্ধে বাক্যালাপ হল এমন একটি বিষয় যাকে আমি সর্বদাই নিরুৎসাহ করেছি— কিন্তু লোকেরা তা করে চলে কেননা সেটি প্রাণময় অহং-এর কাছে আবেদন সৃষ্টি করে।

*

বিশিষ্টতা এবং হীনস্মন্যতার সম্বন্ধীয় ধারণাটির খুব বেশী ব্যবহার অথবা প্রামাণিকতা নেই। প্রত্যেকেই নিজে তার নিজস্ব সম্ভাবনার মাঝে অধিষ্ঠান করছে যেখানে সঙ্কল্প এবং ক্রমোন্নতি ও সময় ব্যতিরেকে কোন সীমারেখা থাকবার প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রত্যেক প্রকৃতিরই তার নিজস্ব চলবার পদ্ধতি রয়েছে এবং সেইসমস্ত ক্ষেত্রে যা অনেক বেশী বিকশিত অথবা অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত, কিন্তু মানটি প্রতিষ্ঠিত হবে তারই নিরিখে সে নিজে যা হওয়ার জন্য লক্ষ্যকে স্থির করেছে। অন্যদের সাথে তুলনা করাটি মূল্যবোধের এক ভ্রান্ত মানের প্রবর্তন করবে। (ক্রমশ)

উৎস: *Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, PP. 1387-90,

অনুবাদ : দেবযানী সেনগুপ্ত

আধ্যাত্মিক ও অতিমানস রূপান্তর

শ্রীঅরবিন্দ

(পূর্বসংখ্যা ২৪ নভেম্বর ২০২১-এর পর)

ওটিই হল মায়াবাদীদের যুক্তি[১] যাদের কাছে সকল প্রকাশই হল তুচ্ছ ও মায়াময় কেননা তা হল অনিত্য— এমনকি দেবতাদের জীবনও নিরর্থক কেননা তা কালের অধীনস্ত যা চিরন্তনতার মধ্যে বিরাজ করে না। কিন্তু যদি প্রকাশের কোনরকম আবশ্যকতা থেকে থাকে, তখন এক অসম্পূর্ণ প্রকাশ অপেক্ষা বরং এক পূর্ণ প্রকাশকে লাভ করাটিই হবে সার্থক পাওয়া। ''দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করতে হবে'' এ হল একটি পরস্পরবিরোধী উক্তি। একজন এক আলোকিত সঙ্কল্পশক্তির দ্বারা যতদিন ইচ্ছা তার দেহটিকে বজায় রাখল, তারপর তাকে পরিত্যাগ করল কিংবা সেই একই সঙ্কল্পশক্তি অনুযায়ী তাকে পরিবর্তিত করে তুলল। সেই ব্যাপারটি, একটি দেহ যা নিরবচ্ছিন্নভাবে বাসনা ও যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে আর ক্ষয়প্রাপ্তি ও অসুস্থতা যে মৃত্যুকে নিয়ে আসছে, তার থেকে সেটি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। সর্বদা বিশ্বাস রেখো যে দিব্যপ্রকাশ অথবা যেকোন প্রকাশই হল প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় বিতর্কটির[২] সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে, পরিবর্তন ও উন্নতিসাধনকে অতিমানস জীবন থেকে ছেঁটে ফেলা হয়নি। আমি এভাবে দেখি না কোষগুলির পরিবর্তনসাধন কেন রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা থেকে সরে যাবে, ধরে নেওয়া যাক অতিমানস দেহের মাঝে সেই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে, আর যদি তা এমন কিছুর পরিবর্তন হয়ে থাকে যা সমভাবের অথবা আরো বেশী সচেতন এবং আলোকিত হয়।

*

আমরা যে রূপান্তরের অন্বেষণ করছি তা হল চেতনাকে ভগবানের মাঝে নিমজ্জিত করা এবং চৈত্যপুরুষকে নিয়ন্ত্রকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা ও তার সাহায্যে সমগ্র চেতনাকে পরিবর্তিত করে তোলা, আর সেইসঙ্গে প্রকৃতিকে ভগবৎমুখী করা যে পর্যন্ত না সমগ্রসত্তা ভগবানের মাঝে বসবাস করতে পারছে। এসবের উপরে রয়েছে অতিমানসীকরণ, যদিও একমাত্র এটিই রূপান্তরকে তার নিজস্ব উচ্চতম ও বিশালতম

[১] ''দৈহিক রূপান্তরের আবশ্যকতাই-বা কি যদি, তৎসত্ত্বেও, স্বেচ্ছাক্রমে (যদি কেউ অবিনশ্বরতার চেতনার মাঝে গিয়ে পৌঁছয়) অথবা অনিচ্ছাক্রমে (অন্যান্য ক্ষেত্রে) দেহকে পরিত্যাগ করতেই হয়?''

[২] ''জড়, বিশেষকরে দেহকোষ, যা প্রতি সেকেণ্ডে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে— তাহলে দেহের জন্য রূপান্তরের কিই-বা মূল্য রয়েছে?''

সম্ভাবনাগুলির মাঝে বহন করে নিয়ে যেতে পারে— অতিমানস তার মৌলিক প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে না।

অমরত্ব হল অতিমানসীকরণের সম্ভাব্য ফলাফলগুলির মধ্যে অন্যতম একটি, কিন্তু এটি কোন একটি বাধ্যতামূলক পরিণাম নয় এবং এর অর্থ এই নয় যে যেমন জীবন ছিল সেই জীবনই এক শাশ্বত অথবা অনির্দিষ্টভাবে দীর্ঘায়িত হবে। অমরত্ব ঠিক কেমন হবে এ ব্যাপারে অনেকে যেমনটি চিন্তা করে থাকে ঐ ভাবনাটি হল ঠিক তাই, অর্থাৎ তারা তাদের সকল মানবীয় বাসনা-কামনাগুলিকে সঙ্গে নিয়ে তারা যেমনটি ঠিক তেমনই থেকে যাবে এবং একমাত্র যে পার্থক্যটি থাকবে সেটি হল তারা সেগুলিকে অবিরতভাবে তৃপ্ত করে চলবে, কিন্তু সেই ধরনের এক অমরত্বকে লাভ করবার মধ্যে কোন মূল্য নেই এবং তা লাভ করবার পরেই তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠতে মানুষের বেশীদিন লাগবে না। ভগবানের মাঝে বসবাস করা এবং ভগবৎচেতনাকে লাভ করা নিজেই হল অমরত্ব আর দেহটিকেও দিব্যায়িত করে তুলতে সমর্থ হয়ে ওঠা এবং দেহকে ভগবৎকর্ম ও ভগবৎ জীবনের জন্য এক সমর্থ যন্ত্ররূপে গড়ে তোলা হবে ভগবৎচেতনার শুধুমাত্র জড়গত প্রকাশ।

*

মৃত্যুকে জয় করবার বিষয়ে কিছু বলতে হলে, এ হল অতিমানসীকরণের উদ্ভূত ফলাফলের মধ্যে কেবলমাত্র অন্যতম একটি— এবং এ ব্যাপারে আমি অবগত নই যে অতিমানস অবতরণের বিষয়ে আমার যে অভিমত তা আমি পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু আমি কখনও একথা বলিনি কিংবা চিন্তাও করিনি যে অতিমানস অবতরণ স্বতঃক্রিয়ভাবে সকলকে অমর করে তুলবে। অতিমানস কেবলমাত্র যে কোন মানুষের জন্যই সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যারা তার দিকে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হতে পারবে যাতে সেইসময় অথবা তার পরে অতিমানস চেতনা এবং তার প্রভাবকে তারা লাভ করতে পারে। কিন্তু তা সাধনার প্রয়োজনীয়তাকে অনাবশ্যক বোধ করতে পারে না। যদি তাই করতো, সেক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত পরিণতি হত এই যে সমগ্র পৃথিবী, মানুষ, সারমেয়কূল এবং কীট-সরীসৃপগণ অকস্মাৎ জেগে উঠে নিজেদের অতি-মানসরূপে আবিষ্কার করতো। আশ্রম অথবা যোগসাধনার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতো না।

অত্যাবশ্যক কেন? যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা হল চেতনার অতিমানস পরিবর্তন— মৃত্যুকে জয় করা হল এমন কিছু যা অপ্রধান বিষয় এবং সর্বদাই আমি যেমন বলেছি, এটি হল অতিমানস পরিবর্তনের সর্বশেষ জড়গত ফলাফল, এর সর্বপ্রথম ফল অথবা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এটি নয়— মৃত্যু-জয় হল এমনই একটি বিষয় যাকে অতিমানসের ঐ সমগ্র কর্মটিকে সম্পূর্ণ করে তুলবার জন্য সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত

করে নিতে হবে, এটি সেই একমাত্র বিষয় নয় যার আবশ্যকতা রয়েছে এবং যা অপরিহার্য। এই ব্যাপারটিকে সর্বপ্রথমে রাখবার অর্থ হল সমস্তরকম আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে বাতিল করে দেওয়া— আর তা এই বুঝাবে যে অন্বেষণকারী সক্রিয় ছিল বটে তবে কোন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দ্বারা নয় বরং জীবনের প্রতি এক প্রাণময় আসক্তির থেকে অথবা দেহটির নিরাপত্তার জন্য এক স্বার্থপরায়ণ ও শঙ্কিত অনুসন্ধান দ্বারা— ঐ ধরনের কোন বৃত্তি অতিমানস পরিবর্তনকে আনয়ন করতে পারে না।

নিশ্চিতভাবে, সকলকিছু আমার সাফল্যের উপরেই নির্ভর করছে...। কিন্তু তুমি কি কল্পনা করেছ যে আমার সেই সাফল্যের অর্থ হবে এই গ্রহের বুকে মৃত্যুর অবসান এবং সেইসঙ্গে যে কোন মানুষের জন্য সাধনার প্রয়োজনীয়তার চিরসমাপ্তি।

(ক্রমশ)

উৎস : ***Letters on Yoga* (Imp. 1988), Part Four, PP. 1231-33,**

অনুবাদ : মনোজ ভট্টাচার্য

পরম সত্য মনের ঊর্ধ্বে

শ্রীমা

আমরা এ বিষয়ে যা ভাবি বা বলি পরমসত্য চিরদিন সে সকলের ঊর্ধ্বে।

১০ ডিসেম্বর ১৯৫৪

*

পরম সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যদি কেউ যথেষ্ট পবিত্র ও বিনম্র হয় তবে সে তাতে বাস করতে পারে।

*

সত্যকার জ্ঞানের দুয়ার অতিক্রম করলে যা জানা যায় তাকে প্রকাশের ভাষা থাকে না।

*

যে সত্যকার জ্ঞানের দুয়ার অতিক্রম করেছে তার আর কিছুই বলার বা শেখার থাকে না।

*

পরম সত্যের আরও কাছাকাছি আসতে হ'লে তোমাকে প্রায়ই মেনে নিতে হবে যে তাঁকে বুঝতে পারা যায় না। ২৫ নভেম্বর ১৯৬১

*

আমি যখন ঠিক কাজ করি কেউ তা মনে রাখে না। আমি যখন ভুল কাজ করি কেউ তা ভুলে যায় না।

তার কারণ প্রকৃত ঠিক বা ভুল বলে কিছু নেই— পরমপ্রভু একমাত্র সত্য এবং তিনি সবই মনে রাখেন। ২৬ জানুয়ারী ১৯৬৩

*

প্রতিটি ধারণা (বা ধারণাগুলির রীতি) তার আপন সময়ে ও ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু যদি তা অন্য সব বাদ দিয়ে একমাত্র ব্রত বলে পরিগণিত হতে চায় বা তার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও থাকতে চায়, তাহলে তা আর সত্য থাকে না।

*

সত্য স্বতন্ত্রতা বা একরূপে নেই। সত্য আছে এক ঐক্যে যা বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান।

*

বুদ্ধিগতভাবে সত্য হ'ল সেই স্থল যেখানে সমস্ত বিপরীতগুলি সম্মিলিত ও একত্রিত হ'য়ে ঐক্যের সৃষ্টি করে।

ব্যবহারিকভাবে সত্য হ'ল অহং-এর সমর্পণ, যাতে ভগবানের জন্ম ও প্রকাশ সম্ভব হয়।

নিজের ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অহং-এর সেরা অস্ত্র সন্দেহ করা।

এই সব মন্তব্য তোমাকে পথের যাত্রায় আর একটু অগ্রসর করতে পারে।

আশীর্বাদ সহ তাদের পাঠালাম। ৬ অক্টোবর ১৯৬৫

*

পরম সত্য মনের ঊর্ধ্বে; নীরবতার মধ্যে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা এবং নিজেকে অতি আন্তরিকভাবে পুরোপুরি সমর্পণ করা অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত। ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩

*

যে আন্তরিকভাবে পরমসত্যের সেবায় নিযুক্ত হ'তে চায়, সে পরমসত্যকে জানবে।

উৎস : *Words of the Mother*, Cent. Edi. Vol. No. 14, PP. 211-214

অনুবাদ : মনোজ ভট্টাচার্য